আমাদের ছুটি
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
www.amaderchhuti.com
বসন্ত উৎসব - শান্তিনিকেতন
আলোকচিত্রী- রত্নদীপ দাশগুপ্ত

☐ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২০☐

সেদিন বাসে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা দুঃখ করছিলেন যে এখন আর পলাশ গাছ দেখতে পান না। পলাশ ওনার বড় প্রিয়। আমি তো ফেসবুকের পাতা খুললেই পলাশ দেখি, কিন্তু কলকাতায় কই তেমন করে মফঃস্বলের ছেলেবেলার মত পথ আলো করা পলাশ-কৃষ্ণচূড়া দেখতে পাই নাতো। এই তো কিছুদিন আগেও ভি আই পি রোডের দুপাশে অনেক বড় বড় নানারকম গাছ ছিল – বাসে করে যেতে যেতে দেখতাম ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে। গাছগুলোকে নাকি বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে কংক্রিটের ব্রিজ উঠবে বলে...

উফ্ কী গরম...ভাবছিলাম দুত্তোর বসন্তটাই যেন কোথায় হারিয়ে গেল! কলকাতায় বসন্ত যেন আর আসে না, মনকেমনের বাতাস উড়িয়ে দেয় না খোলা চুল... অথচ বেশ কয়েকবছর আগে কিন্তু এমন ছিল না। এখন কোকিল ডেকে উঠলে ভাবি নিশ্চয় কারো মোবাইলের রিং টোন।

বসন্তকে খুঁজতে খুঁজতেই পৌঁছে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। প্রবল গরম আর ততোধিক ভিড়। কী পেলাম জানি না। মাটির ঘরে রাত কাটিয়ে, নিকোনো মেঝেতে বসে ছেলেবেলার গন্ধমাখা কলাপাতায় ভাত খেয়ে, কয়েকজন উষ্ণ মনের মানুষের সান্নিধ্যে কিছু সময় থেকে আর অনেক অনেক অচেনা মানুষের দেওয়া আবিরে ভরে উঠতে উঠতে মনে হল আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...।

বসন্তের রঙের বাসর ফুরোতে না ফুরোতেই এসে যায় বাঙালির প্রিয় পার্বণ নববর্ষ। আরো একটা বছর পেরিয়ে এল 'আমাদের ছুটি'-ও। এপার ওপার - দুই বাংলা আর প্রবাসী সব বন্ধুদের জন্য রইল নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা। সবাই এগিয়ে চলুক নিজের বিশ্বাসে, বাঙালি জাতিসত্তার লড়াইয়ে, ভালোবাসায়। আমরা একসঙ্গে আরও অনেক পথ হাঁটব।

www.amaderchhuti.com

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

কথোপকথন

""উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের পর থেকে পাহাড় শুরু হয় – এই উঁচু, এই নীচু। একেবারে শেষ সীমানায় একটা বিরাট পাহাড় আছে - উড়িষ্যা থেকে যখন মাদ্রাজে ঢুকছে। পিঁপড়ের সারির মত ট্রাকগুলো ঘুরে ঘুরে রাস্তা দিয়ে উঠছে। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে উঠেছি আমরা" – রিক্সাচালক গৌর কবিরাজের বিচিত্র ভ্রমণকথা এবারের আড্ডায়।

☐ আরশিনগর ☐

মায়াবী দীপচর আর সাদা পাহাড়ের কথা
– সালেক খোকন

বসন্ত উৎসব, ভারতবর্ষ ও একটি ভূতের গল্প
– দময়ন্তী দাশগুপ্ত

মেঘ কুয়াশায় একা একা এলোমেলো – তুহিন দাশ খোকন

☐ সব পেয়েছির দেশ ☐

ছোট্ট টুপুরের বড় ট্রেকিং – ঝুমা মুখার্জি

☐ ভুবনডাঙা ☐

অচিন্ত্যনীয় চিন্তাফু – মানব চক্রবর্তী

www.amaderchhuti.com

এক ভ্রমণে দুই দেশ – মঞ্জুশ্রী সিকদার

☐ শেষ পাতা ☐

অতীতের খোঁজে – মার্জিয়া লিপি

বাংলার এক হারিয়ে যাওয়া মন্দিরে – অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

[বেড়ানো একটা তীব্র নেশা, এ মাদকের সুখ যে একবার পেয়েছে, সে বারবার সেই আস্বাদ পেতে চায়। তেমনই এক পায়ের তলায় সর্ষে রাখা মানুষ গৌর কবিরাজ। চন্দননগরের ছেলে গৌরের কোনদিনই আকর্ষণ ছিল না পৈত্রিক ব্যবসায়। শেষে বাবার সঙ্গে মতে না মেলায় বেছে নিলেন পথকেই। যাত্রাদলে অভিনয়, সাউন্ড বক্স ভাড়া দেওয়া, বাচ্চাদের স্কুলে ভ্যানরিকশায় পৌঁছে দেওয়া, রিকশা চালানো এমন বিচিত্র সব পেশার পাশাপাশি নেশা কেবল একটাই – আর তা ভ্রমণ। এমনকী সে এমন নেশা যে বেচে দিয়েছেন নিজের অনেক কষ্টে তৈরি করা ঘরবাড়িও। ভ্রমণের ধরণও বড় বিচিত্র। ছেলেবেলায় বেরিয়ে পড়তেন সাইকেল নিয়ে। আর বড় হয়ে রুটিরুজির সঙ্গী রিকশা কিম্বা ভ্যানরিকশায় চড়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ভারতভ্রমণে।]

রেললাইনের ধারে ছোট্ট চালাঘর। পিছনে নিজের হাতে গড়া সবুজ বাগানে দু'হাত ছড়ানো কাকতাড়ুয়া দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা ভ্যানরিকশার টুকরো অবয়ব। যে সঙ্গী ছিল গত বেড়ানোয়, আর যে সঙ্গী হবে আগামী ভ্রমণে। ঘরের দুয়ারে বিশ্রাম নেয় রোজের বন্ধু রিকশাটি। ট্রেনের আওয়াজের ব্যাকগ্রাউন্ডে পঁয়ষট্টি বছরের তরুণ ভ্রামণিক গৌরের মুখের রেখায় আলোছায়া খেলে। দু'চোখে পৃথিবী দেখার স্বপ্ন।

www.amaderchhuti.com

◆ বেড়ানোর নেশা ছোটবেলা থেকেই?

□এ নেশা বড় বাজে জিনিষ দিদি – একবার যাকে ধরেছে আর ছাড়েনা। ছোটবেলা থেকেই দেশ দেখার আগ্রহ ছিল। ১৫-১৬ বছর বয়সে আমরা তিন ভাই মিলে সাইকেলে করে পুরী গিয়েছিলাম। সেই থেকে শুরু। তারপর পুরীই গেছি বোধহয় বার ছয়েক।

◆ আপনিতো কবিরাজ বাড়ির ছেলে, বাবা-কাকারা নিশ্চয় ডাক্তারি করতেন। রিকশা চালানোর এই পেশায় এলেন যে?

□ডাক্তারি করতেন আমার দাদু। বাবার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা ছিল। চন্দননগরেই আমাদের নিজেদের বড় বাড়ি আছে – ভাইরা থাকে। ব্যবসা করা আমার ঠিক পোষালো না। আমি নিজের জীবনটা নিজের মতো করেই গড়েছি – নানারকম কাজ করেছি। অন্যদের মদের নেশা থাকে, কী অন্য কোন নেশা থাকে। আমার একটাই নেশা – বেড়ানো। গানবাজনাও ভালো লাগে। এই যে দেখছেন সব সাউন্ডের যন্ত্রপাতি, অনুষ্ঠানে ভাড়া দিই – অবশ্য রিকশাওলার থেকে সবাই ভাড়া নেয়না। কিছু চেনা লোকজন আছে। একসময় যাত্রা দলে এসবের জোগান দিতাম। নিজেও অভিনয় করেছি। যাত্রা করার সূত্রেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছি। বিয়ের পরে আমাদের একমাত্র ছেলের যখন চার বছর বয়স তখন ১৬০০ টাকায় একটা লুনা গাড়ি কিনি। এইসময় আমি একজায়গায় কাজ করতাম। স্বাধীন ভাবে কিছু করার ইচ্ছে হল। এরপর কাজটা ছেড়ে দিয়ে একটা রিকশা কিনি।

◆ পেশাটাই আবার নেশা! এটাওতো খুব অদ্ভুত – মাথায় এল কী করে?

□সবাইতো ট্রেনে, বাসে কিংবা উড়োজাহাজে করে বেড়াতে যায়। আমি সেই লুনা গাড়িতেই স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আবার পুরী গিয়েছিলাম। সেবারে আমাদের পুরো বেড়ানোয় দশ দিন লেগেছিল। রিকশাটা কেনার পর মনে হল এবারে রিকশা করে পুরী গেলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। টাকাপয়সা জোগাড় করে চাল,ডাল, তেল, নুন, মুড়ি, চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে একদিন আমরা তিনজনে মিলে রিকশায় করে পুরী রওনা দিলাম। আমরা কুড়ি দিনের মধ্যে পুরী ভ্রমণ করে ফিরে আসি। এভাবেই শুরু। ভ্যানে করে যাওয়ার পুরো পরিকল্পনাও আমার। আগে ইস্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে যেতাম। মনে হল ভ্যানে করে গেলে যেখানে খুশি রাত্তির হবে ঘুমিয়ে পড়ব। বিছানাপত্তর নিয়ে যেতে পারব। রান্না করে খাব।

◆ শুধু তিনজনেই বেরিয়ে পড়েন?

□ হ্যাঁ, আর কে যাবে! হা...হা...(হাসি) আর কে পাগল আছে আমাদের মত? অবশ্য তিরুপতি যাওয়ার সময় প্রথমে একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধা সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রওনা হওয়ার পরে পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় বারাসত থেকে যোগাযোগ করে তাঁকে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হল।

◆ গৌরদা, কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছেন এভাবে?

□. পুরীই গেছি প্রায় বার ছয়েক। আর বড় বেড়ানো বলতে একবার গেছিলাম বেনারস, গয়া, রাজগীর আর দেওঘর। এই বেড়ানোয় আমাদের প্রায় দু'মাস সময় লেগেছিল। তবে সবচেয়ে বেশী সময় লেগেছিল তিরুপতিতে - তিনমাস। ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বেড়ানো। তাছাড়া প্রায়ই ছোটখাট টুকটাক বেরিয়ে পড়ি। এইতো ক'দিন আগে নবদ্বীপ-মায়াপুর ঘুরে এলাম।

◆ তিরুপতিতো বহু দূর। এতটা পথ ভ্যানরিকশা নিয়ে, সাহসটা কীকরে হল? রওনা দিয়েছিলেন কবে?

□পুরী গেলাম। বেনারস গেলাম। তারপরে লোকজনে জিজ্ঞাসা করছে এবার কোথায় যাবে? কোথায় যাব, কোথায় যাব করতে করতে কেউ কেউ বলল, তিরুপতি যাও। যাও বললেই কি যাওয়া যায়? তিরুপতি কোথায় আর পুরী কোথায়, বহু বহু দূর। তবে বেনারস ঘুরে আসার পর খবরটা এখানকার কাগজে বেরিয়েছিল। স্থানীয় এক সংস্থা থেকে আমাদের একটি পুরস্কারও দেওয়া হয়। এতে আমাদের মনের জোরও বেড়ে যায়। তিরুপতি যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। শেষে ২০০৮ সালের ১৩ নভেম্বর ভোর পাঁচটায় আমি, আমার স্ত্রী শুক্লা কবিরাজ আর আমার পুত্র পার্থ কবিরাজ - এই তিনজনে মিলে সাইকেল আর ভ্যানরিকশা নিয়ে চন্দননগর রবীন্দ্র ভবন থেকে তিরুপতির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম।

◆ এত দূরের যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার খরচতো অনেক। কীভাবে যোগাড় করলেন?

□□ চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি আর দু-একটা স্থানীয় সংস্থা ও কয়েকজনের ব্যক্তিগত সাহায্যে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মত সংগ্রহ হয়। আমি নিজেও এই যাত্রার জন্য ইতিমধ্যে পনের হাজার টাকা জমিয়ে ছিলাম। তাছাড়া অনেকেই চাল,ডাল, বিস্কুট, মুড়ি এসবও দিয়েছিলেন। পথ চলতে চলতেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। লোকজন টাকাপয়সা দিয়েছেন, থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন, গ্রামের মানুষ চাল-ডাল বেঁধে দিয়েছেন। রাস্তায় গাছ থেকে পেড়ে ফল খেয়েছি, মন্দিরের প্রসাদ। পথে পুলিশও খুব সাহায্য করেছে, তিরুপতি পৌঁছেও। সবার শুভেচ্ছা ভালোবাসাতেই এতটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছি।

◆ এতটা রাস্তা যাওয়া, পথ চিনতে অসুবিধা হল না?

□চার জায়গা থেকে ম্যাপ করে নিয়ে গেছি। কী জানি যদি কিছু ভুল হয়। প্রত্যেকটা জায়গার নাম, দুটো জায়গার মধ্যে কতটা দূরত্ব সব যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে। বাসে করে বেড়াতে নিয়ে যায় যারা, তারা ম্যাপ করে দিয়েছে, পুলিশ থেকেও একটা ম্যাপ দেয়, এছাড়া আমার চেনা লোক আছে যারা ম্যাপ করে দেয়।

◆ আর ভাষার সমস্যা হয়নি? আমাদের দেশে সেটাওতো একটা বড় অসুবিধা।

□□ ও বাবা, সেতো বিরাট সমস্যা। বেনারস যাওয়ার সময় তেমন অসুবিধা না হলেও দক্ষিণের গ্রামের লোকজন তো হিন্দিও বোঝেনা। উড়িষ্যার বালুরগাঁও-এ সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই মন্দিরের পূজারী ছিলেন এক বাঙালি মহিলা। তিনি আমাকে অনেককিছু লিখে দিয়েছিলেন - নুনকে কী বলে, জলকে কী বলে, এক টাকাকে-দু টাকাকে কী বলে - নুনকে বলবে 'অপ্পু', জলকে বলে 'নীরু', ভাতকে বলে 'ভীমু'।

◆ এভাবে এতটা পথ ভ্যানরিকশা টেনে যাওয়াটাওতো বেশ শক্ত। একাই চালান?

□হ্যাঁ, রান্না-খাওয়ার জিনিষ, বিছানাপত্র নিয়ে খুব ভারি হয়ে যায়। তাছাড়া রিকশার ওপরের লোহার খাঁচাটার ওজন-ও অনেক। একঘন্টা অন্তর আমরা দাঁড়াই আর খাই। চা রেডি থাকে ফ্লাস্কে। ছাতু আছে, চিঁড়ে আছে, মুড়ি, বিস্কুট। খুব দরকার পড়লে ছেলে চালায়। নইলে ও সাইকেল নিয়ে পাশে পাশে চলে। দরকারে মায়ে-ব্যাটায় গাড়ি ঠেলে। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের পর থেকে পাহাড় শুরু হয় - এই উঁচু, এই নীচু। একেবারে শেষ সীমানায় একটা বিরাট পাহাড় আছে। উড়িষ্যা থেকে যখন মাদ্রাজে ঢুকছে। পিঁপড়ের সারির মত ট্রাকগুলো ঘুরে ঘুরে রাস্তা দিয়ে উঠছে। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে উঠেছি আমরা।

◆ এতটা পথ যেতে কোন বড় বিপদে পড়েননি?

□সেরকম কোন বিপদের মুখে পড়িনি, গাড়ি টুকটাক খারাপ হয়েছিল, সেসবতো নিজেই সারিয়ে নিতে পারি। টায়ারতো খারাপ হয়েছেই। যাতায়াতে ৪০০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়েছি। বাংলা পার হয়েছি, উড়িষ্যা পার হয়েছি, অন্ধ্রের শেষ সীমায় চলে গেছি। যেতে যেতে টায়ার খতম হয়ে গেল। সাইকেলের টায়ার কিনতে হল। ওখানে সাইকেল চলে। রিকশা দু-একটা ডিস্ট্রিক্টে চলে। আর অন্যরকম কোন বিপদে পড়িনি। ভগবানই খাবার দাবার, থাকার জায়গা সব জুটিয়ে দিয়েছেন। রাতে কোথাও কোন ঘরে থাকতে পেলে ভ্যান বাইরে পথেই থেকেছে - ওপরের খাঁচাটায় তালা দেওয়া থাকে। আর থাকার জায়গা না জুটলে গাছতলাতেই থেকেছি, বৌ ভ্যানে শুয়েছে আর আমরা বাপ-ব্যাটায় মাটিতে। সাধুবাবা সেজে গেছিতো (হাসি) তাই চুরি-ডাকাতির কোন ভয় হয়নি। মাওবাদীরা ধরেছে, তারাই আমাদের খাইয়েছে, থাকবার জায়গা করে দিয়েছে, টাকা-পয়সা দিয়েছে। চোর চুরি করতে এসেও বাবাজী বাবাজী বলে পায়ে ধরছে, ভালো রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। বলে আমাদের গ্রামে থাকবে চল। গ্রামে নিয়ে গিয়ে বলল ঘোরো একবার। সবাই চাল-ডাল এটাসেটা দিল, দেখলাম ভালোই ধান্ধা হল।

◆ ওরেবাবা! দারুণ আইডিয়াতো - সাধুবাবা সেজে যাওয়ার পরিকল্পনাও কি আপনার?

□ না, না। বালুরগাঁও-এর সেই মহিলা পূজারীই বুদ্ধি দিলেন। বললেন, তোরা তিরুপতি যাবি তো তোদের কাপড়-চোপড় বদলাতে হবে - সাধুর বেশে যেতে হবে। আমরা পাঁচশ টাকা দিয়ে নতুন কাপড়জামা কিনে সাধুর বেশ ধারণ করলাম। তিনজনেরই মাথায় ফেট্টি - তাতে লেখা জয় বাবা তিরুপতি। রিকশাতেও তিরুপতির ছবি লাগিয়ে নিলাম। বাকী পথটায় এতে সত্যিই খুব সুবিধা হয়েছিল। না হলে লোকে বেশ সন্দেহের চোখেই দেখছিল প্রথম প্রথম - ভ্যান রিকশা নিয়ে এতদূর বেড়াতে এসেছি এটা পথে গ্রামের লোকদের বোঝানো বেশ শক্তই হয়ে উঠছিল। ভাবছিল এদের নিশ্চয় অন্য কোন মতলব আছে!

◆ এই বেড়ানোয় তেমন কোন অভিজ্ঞতার কথা কি মনে পড়ছে যখন হঠাৎ বেশ ভয় পেয়েছিলেন বা খুব অদ্ভুত লেগেছিল?

www.amaderchhuti.com

☐তেমন পরিস্থিতিতো হয়েছেই, তবে খুব ভয় পেয়েছিলাম তা বলব না। বাবা তিরুপতির নাম করে বেরিয়েছি ভগবানই দেখেছেন আমাদের। সেরকম ঘটনা বলতে মনে পড়ে - ওয়ালটেয়ারের দিকে যাচ্ছি - জনবসতি শেষ হয়ে জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ দেখি জঙ্গলের মধ্যে থেকে তীরধনুক, টাঙ্গি আর বন্দুক নিয়ে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। বুঝলাম এরা মাওবাদী। আমাদের ব্যানারে চারটে ভাষায় লেখা ছিল। সেটা দেখে ওরা বুঝতে পারল যে আমরা তিরুপতি ভ্রমণে যাচ্ছি। ওরা নিজেরাই আমাদের ৫০০ টাকা দিয়ে বলল ফেরার পথে এখান দিয়ে ঘুরে যেতে। খুব ভয় না পেলেও প্রথমে একটু চমকে গিয়েছিলামতো বটেই।

এর আগেরদিন উদয়গিরি, নয়াপাড়ায় আমরা যেতে যেতে দেখি রাস্তার দুপাশে বিরাট বিরাট গাছ আর তাতে অগুন্তি বাদুড় ঝুলছে। এত বড় বাদুড় আমরা কখনও দেখিনি। একেকটার ওজন প্রায় ২-৩ কেজির মত হবে। সেটা বেশ অদ্ভুত লেগেছিল।

আর এর দিন তিনেক পরে যাওয়ার পথে আর একটা খুব অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়েছিল - একটা বাঁদর ছ'-সাতটা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে আর বাচ্চা কুকুরগুলোর মা কিছু দূরে গাড়ি চাপা পড়ে মরে পরে আছে। মনটা খারাপও লাগছিল বাচ্চাগুলোর জন্য।

◆পথেতো বেশ কয়েকবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়েছেন, কোন জন্তুজানোয়ার চোখে পড়েনি?

☐দেখেছিতো অন্ধ্রের জঙ্গলে, উড়িষ্যায়। ভালুক তার ছানা নিয়ে ঘুরছে, হাতির দল বেরিয়েছে, ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই মোটা মোটা সাপ। রাতে শুয়ে শুয়ে শেয়ালের ডাক শুনছি। সে এক অভিজ্ঞতা (হাসি)।

এত কষ্ট করেতো গেলেন, তিরুপতির মন্দির দেখে কেমন লাগল?

☐বাবা সেতো এলাহি ব্যাপার। পুলিশই বলে দিল যে মন্দিরে পুজো দিতে হলে রাত দু'টো থেকে লাইন দিতে হবে। ভোর পাঁচটায় টিকিটঘর খুলল। আমাদের কাছ থেকে অবশ্য কোন টাকাপয়সা নেয়নি। তারপর বাসে চড়লাম। মাথাপিছু টিকিট ৪৫ টাকা। পাহাড়ের ওপরে ঠাকুরের গেটে পৌঁছে লাইন দিলাম। তখন বাজে সকাল আটটা। মন্দির খুলল বেলা এগারটার সময়। ৫ টাকার কুপন কেটে মন্দির দর্শন হল। এত কষ্ট, পরিশ্রম, খরচ করে এসে ঠাকুর দেখতে সময় দিচ্ছে মাত্র এক মিনিট। ঠাকুরটা পুরো সোনার। আর কত যে টাকা-পয়সা তার কোন হিসেব নেই।

ঠাকুর দেখে মন না ভরলেও এই যে এতটা পথ গেলাম, কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য একেবারে কাছ থেকে দেখলাম - নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ঝরনা, জঙ্গল - কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল এতেইতো মন ভরে গেছে। গঞ্জাম থেকে পলাশি যাওয়ার পথে একটা জায়গায় পাহাড়ে উঠে দেখি সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর! চলার পথে এমন কত সুন্দর জায়গা, কত সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়েছে। পথে বেরিয়ে খড়গপুর কিষাননগরে পৌঁছে একটা সারের দোকানের মালিককে রাতের মত একটা থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করতে উনি নিজের বাড়িতেই নিয়ে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করিয়ে স্থানীয় একটা স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পরদিন সকালে ভদ্রলোক আমাকে ১০১ টাকা দিয়ে যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন উনিও একসময় খুব বেড়াতে ভালোবাসতেন। এরকম আরও কত মানুষকে পেয়েছি চলার পথে।

www.amaderchhuti.com

◆. এরমধ্যে আবার কোথাও বেরিয়ে পড়ছেন নাকি?

☐ইচ্ছা আছে জগদ্ধাত্রী পুজোটা হয়ে গেলেই হরিদ্বার - মথুরা-বৃন্দাবনের পথে বেরিয়ে পড়ব সপরিবারে - যা হিসেব করেছি মোটামুটি চারমাস লাগবে ঘুরে আসতে। তবে খরচ তো অনেক - এই তো ভ্যানের ওপরের খাঁচাটা নতুন করে বানালাম - চার হাজার টাকা লাগল। কেউ যদি সাহায্য করতে চান তো ৯৮৩৬৮৬৫০৯৭ এই নম্বরে একটু যোগাযোগ করতে বলবেন, খুব উপকার হয়।

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

tell a Friend

মায়াবী দীপচর আর সাদা পাহাড়ের কথা

সালেক খোকন

~ তথ্য - দীপচর ~ দীপচরের আরো ছবি ~

নদীর বুকে বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা। সোনালী - লাল বালুময় পথ। পা রাখতেই দেবে যায় গোড়ালি অবধি। এক পাশে তিরতির করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী। নদীতে স্রোত নেই তেমন। বর্ষায় ওর রূপ খোলে। তখন সোমেশ্বরী হয় স্বাস্থ্যবতী। চরের ভেতর সাদাফুলের কাশবাগান। লম্বা লম্বা কাশফুলগুলো বাতাসে দুলছে। নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে নদীর পানিতে। দূর থেকে মনে হয় শিল্পীর তুলির আচড়ে আঁকা একটি ছবি। ছবির মতো চর। চরের ওপাশে অন্য দৃশ্য। সবুজে ঘেরা উঁচু উঁচু সব পাহাড়। যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়গুলো। কয়েকটি আবার পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে সামনের দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। দেখতে বেশ লাগে। সবচেয়ে বড় পাহাড়ের চূড়াটি একেবারে মেঘে ঢাকা। দূর থেকে মনে হয় একটি পাহাড়ের ছায়া যেন পড়েছে অন্যটিতে। আকাশ একেবারে ঝকঝকে নীল। মাঝে মাঝে তুলোর মতো সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। বালুচরের কাশফুলের বাগানে বসে এমন দৃশ্য দেখতে কার না ভালোলাগে?

সামনেই দুর্গাপূজার ছুটি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বন্ধু সুমন জানালো আটাশজনের একটি দল যাবে সুসং দুর্গাপুরে। বিরিশিরিসহ ঘুরবে বেশ কিছু জায়গায়। দুর্গাপূজায় দুর্গাপুরে। একবাক্যেই রাজি হয়ে গেলাম। সকাল ৭টায় মহাখালি বাস স্ট্যান্ডে থাকার এলান জারি হয়। দুর্গাপুরের উদ্দেশে বাস ছাড়ে ৭.৩০-য়।

www.amaderchhuti.com
© Saleh Khokon

মাত্র পাঁচ ঘন্টা লাগল নেত্রকোনার শুকনাকুড়ি যেতে। যানগুলি বুঝি ছুটি কাটাতে গিয়েছে তাই জট পাইনি কোথাও। তবে রাস্তার সে কী অবস্থা! মনে হলেই কান্না পায়। শুকনাকুড়ি থেকে পৌনে এক ঘন্টা লাগল বিরিশিরির ওয়াইএমসি-র রেস্ট হাউজে পৌঁছতে।

পেটের তখন ত্রাহি অবস্থা। সাফসুতরো হয়ে খাবার ঘরে ঢুকলাম। ভাজি,ডাল আর দেশি মুরগির গোশত - অমৃত ঠেকল। খেয়ে উঠে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নেই।

ট্যুর ম্যানেজার করা হয়েছে রবিকে। ব্যস্ততায় বেচারা ত্রস্ত। গলাটা বেশ ভারি করে বলল,ঠিক চারটায় রওনা দিব। কেউ লেট করলে পশতাতে হবে। বন্ধু সুমনও বেশ ব্যস্ত। ছবি তোলার কাজ নিয়েছে সে। ভাইয়া আমার একটা বলতেই আর রেহাই নেই - একটু ডানে সরো, ঘাড় সোজা করো, মুখটাকে পাঁচের মতো করে রেখো না ইত্যাদি বলছে আর ক্লিক করছে।

ইঞ্জিনচালিত বড় একটি নৌকা ঠিক করাই ছিল। বিরিশিরি ঘাট থেকে ভেসে যাই সোমেশ্বরীর বুকে।

সবাই যেন শরতের রূপে বিভোর। ছবি তোলায় ব্যস্ত কেউ কেউ। সুমন বসেছে নৌকার ঠিক সামনের অংশে। সোমেশ্বরীর প্রেম কাহিনি শোনাচ্ছে মেয়ে বন্ধুদের - প্রেম না পেয়ে সোমেশ্বরী কেঁদেছিল অঝোরে। সেই কান্না নাকি এই নদী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে! আমি ভাবি, আজকালকার মেয়েদের এসব শুনিয়ে কাত করা যায়? নৌকা এগোতে থাকে। পথ দেখাচ্ছে গোপাল, মঞ্চ নাটকে নিবেদিতপ্রাণ।

কেউ কেউ পা ঝুলিয়ে বসে সোমেশ্বরীর জলের স্পর্শ নিচ্ছে। কেউবা আবার তা দেখে মুখ টিপে হাসছেও।

আমাদের নৌকা সামনে এগোতে থাকে। গাইড গোপাল জানালো এই নদী পথেই যাওয়া যায় বিজয়পুরের জিরো পয়েন্টে। যাওয়ার পথে দেখা মেলে মেঘালয়ের বড় বড় পাহাড়গুলোর। অন্যরকম সে দৃশ্য।

গোপালের কথাই ঠিক, মিনিট বিশেক চলতেই মেঘালয়ের পাহাড়গুলো আমাদের দৃষ্টির সীমানায় চলে আসে। মন ছুঁয়ে যায় সে দৃশ্য। সবার মধ্যেই অন্যরকম উত্তেজনা। এমনকী গম্ভীর রবিও চেঁচিয়ে ওঠে।

ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক শব্দ। অন্য দু'একটা নৌকা ভর্তি লোকজন নিয়ে খেয়া পার হচ্ছে। এদেরই একটিকে পাশ দিয়ে আমাদের নৌকা সামনে এগোয়।

নদীর জল একেবারে কাচের মতো ঝকঝকে। পাহাড়ি নদীগুলোর জল নাকি এমনটাই হয়। নীল আকাশের ছায়া পড়েছে সে জলে। নদীর জলে আকাশ দেখতে অন্যরকম লাগে। হঠাৎ কার যেন কণ্ঠ বেজে ওঠে। তাকিয়ে দেখি সেজতি গান ধরেছে - এই নদীতে সাঁতার কাইট্টা বড় হইছি আমি, এই নদীতে আমার মায়ে কলসিতে নিত পানি...। গানের সুরে আমাদের মন হারিয়ে যায় অন্য কোনোখানে।

দূর থেকেই একটি চরের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। গোপাল জানায় এটি দীপচর। বর্ষায় এ চরের দেখা মেলাই ভার। অজস্র সাদা কাশফুল ফুটে আছে চরটিতে। দূর থেকেই বেশ দেখা যাচ্ছিল ফুলগুলোকে। চরের ওপাশে মেঘালয়ের পাহাড়গুলি বেশ দেখাচ্ছে। সবমিলিয়ে ছবির মতো।

এমন সুন্দর চর এর আগে কখনও দেখি নি। এই চরে পা না রাখলে কি হয়? সবার আগ্রহে মাঝি নৌকা ভেড়ান দীপচরের ঘাটে।

দীপচরে পা রাখতেই হারিয়ে যায় বৃষ্টি আর শারমিন। সবাই ছুটোছুটি করছে চরের বালিতে। ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মেয়েরা ঘুরে ঘুরে দেখছে চরের কাশফুলগুলোকে।

কে কোথায় খোঁজ নেই। মিনিট ত্রিশেক পরেই স্মরণে আসে বৃষ্টি আর শারমিনের কথা। রবি, দীপ,তানিয়া আর সুমনসহ আমরা দীপচরের কাশফুলের বাগানে

খুঁজে ফিরি তাদের।

শেষে দেখি তারা বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে। চরের এ পাশটাতে পাহাড়গুলো খুব পরিষ্কার। দুই বান্ধবী এককোণে বসে পাহাড় দেখার আনন্দে মজে আছে। চুটিয়ে গল্প করছে বৃষ্টি আর শারমিন। হাতে কয়েকটি কাশফুল। কথার ফাঁকে ফাঁকে কাশফুলের সাদা পাঁপড়িগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে নীল আকাশের দিকে। তাদের হাসিতে চারপাশের নীরবতা কাটে। তা দেখে আমাদেরও লোভ হয়। আমরাও কাশফুলের পাঁপড়ি উড়িয়ে পাহাড় দেখি বৃষ্টিদের সাথে।

সূর্যটা ডুবুডুবু। নদীর ওপাশের গ্রামের পেছনে অস্ত যাচ্ছে। লালচে কমলা রঙের আলো ছড়িয়ে আছে আকাশময়। অস্তমিত সূর্যের ছায়া এসে পড়ছে সোমেশ্বরী নদীর পানিতে। সবাই এসে জড়ো হই চরের একপাশে,নদীর ধারে। দীপচরে বসে দেখি সূর্যডোবার অপরূপ দৃশ্য।

চারপাশে অন্ধকার কাটিয়ে মুখ তুলে তাকায় আশ্বিনের চাঁদ। চাঁদের ঐশ্বর্যময় আলোতে দীপচরের রূপ যায় পাল্টে। চাঁদের আলোতে নিজেদের মুখ দেখা। আর দীপচরের বালিপথে ছুটোছুটি চলে খানিকক্ষণ। চরের মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে বালি ছড়াতে ছড়াতে সবাই নেমে পড়ি নদীর জলে। চাঁদের আলোতে সোমেশ্বরীর জলে সাঁতার কাটতে বেশ লাগে। মনে পড়ে যায় ছেলে বেলার দুরন্তপনার কথা। সোমেশ্বরীর জলের উষ্ণ পরশে প্রাণ জুড়িয়ে যায় আমাদের। নদীর জলে শরীর ভাসিয়ে আমরা দেখি মায়াবি চাঁদটাকে।

সাঁতার কেটে সবাই ক্লান্ত। শরীরটাকে হেলিয়ে দেই নৌকায়। তাকিয়ে থাকি আকাশ পানে। তারায় ভরা আকাশ। চাঁদটা যেন তাকিয়ে দেখছে সবাইকে। মাঝি লগি মেরে নৌকা ভাসায়। আমরাও বিদায় জানাই দীপচরটিকে। নৌকায় বসে মিষ্টি কণ্ঠে এবার সামিয়া গান ধরে - আজ জোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...। গানের সুরে দোল খায় আমাদের অনুভূতিগুলো। ক্রমেই দীপচর দূরে সরে যায়। সবাই তাকিয়ে থাকি চরের দিকে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোতে দূর থেকে অপরূপ দেখায় দীপচরকে।

রাতের খাবার সেরে সবাই যে যার কামরায়। বাইরে বসে আড্ডা জমায় মনির,তানিয়া আর সুমন। রবি এলান জারি করে,সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে। এত সকালে কেন? মুচকি হেসে রবি উত্তরে বলে,কাল যাব সাদা পাহাড়ের দেশে।

সুমন সেখানে গিয়েছিল বার কয়েক। তাই সে আলাপ জমায়।

পাহাড়গুলো অন্যরকম। সবুজের মাঝে সাদা পাহাড়গুলোকে রূপসী রমণীর মতো দেখায়। লাবন্যময়ী এ পাহাড়ের গায়ের রঙ ফর্সা। স্পর্শ করলেই হাতে পড়ে পাউডারের মতো সাদা প্রলেপ।

তানিয়ার প্রশ্ন, তারপর?

একটি পাহাড় আরেকটি পাহাড়ের সঙ্গে লাগানো। দুই পাহাড়ের মাঝে মাঝেই জমে বৃষ্টির পানি। সে পানির রঙ! সে তো অপরূপ। একেবারে নীলাভ সবুজ। স্বপ্নের মতো দেখায় সাদা পাহাড়গুলোকে।

www.amaderchhuti.com

সত্যি ? তানিয়ার কথায় সুমন উত্তর দেয় না। বলতে থাকে।

পাহাড়ের ওপরের দিকে যতই উঠি,ততই সবুজ সম্রাজ্য চোখের সামনে ধরা দেয়। একদিকে দূর মেঘালয়ের উঁচু উঁচু সব পাহাড়। অন্যদিকে ছোট্ট ছোট্ট পাড়া। সবুজ ধানক্ষেতে দলবেঁধে নামছে সাদা বক। পাশেই বাঁশের ঘের দেওয়া একটি মাটির বাড়ি। বাড়ির ভেতরে অনেকগুলো কলাগাছ। হাওয়ায় দুলছে কলাপাতাগুলো। এক যুবক গাছের ছায়ায় বসে কী যেন ভাবছে। পাশেই চড়ে বেড়াচ্ছে গরু-ছাগলগুলো। সাদা পাহাড়ের উপর থেকে সবকিছু দেখতে ছবির মতো লাগে।

সব শুনে তানিয়ার ঘুম যেন ছুটে যায়।

সকাল ৭ টা। দুর্গাপুর উপজেলাকে পেছনে ফেলতেই রাস্তা শেষ। এবার সোমেশ্বরী পেরোতে হবে। আহা! দিনের আলোতে পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরীকে দেখা। শিবগঞ্জ গুদারা পাড় হই আমরা।

কামারখালির পথ পেরোতেই হাজং মাতা রাশিমনির স্মৃতিসৌধ। এর পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তাটি চলে গেছে কুলস্নাগড়া ইউনিয়নের দিকে। এখানেই রয়েছে চিনামাটির সাদা পাহাড়গুলো। সবুজ ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে চলে গেছে একটি মেঠো পথ। সে পথেই ধুলো উড়িয়ে আমরা চলে আসি একেবারে শেষ প্রান্তে।

গ্রামের নাম কেন বগাউড়া ? তা জানা নেই স্থানীয়দের। একটি হাজং পাড়ার সামনে এসে থেমে যাই আমরা।

সবাই হাঁটছি। আমাদের ভেতর চিনামাটির পাহাড় দেখার তেষ্টা। হঠাৎ চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় উঁচু একটি পাহাড়। এপাশ থেকে ওপাশকে ঠাহর করা কঠিন। আমাদের দিকে সুমনের চোখ পড়তেই বুঝে ফেলি চলে এসেছি সাদা পাহাড়ের দেশে।

আমরা পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকি ওপরের দিকটায়। পাহাড়ের গায়ে জমানো পানি চমৎকার দেখায়। সুমনের কথাই ঠিক,ওপরে উঠতেই মেঘালয়ের পাহাড়গুলো আমাদের দৃষ্টির সীমানায় চলে আসে। মন ছুঁয়ে যায় সে দৃশ্য।

চিনামাটি, পানি ও প্রকৃতির নয়াভিরাম দৃশ্যে বিমোহিত হই আমরা। পাহাড়ের মাটিগুলো নানা রঙের। সাদা, গোলাপী, হলুদ, বেগুনি, খয়েরী, নীলাভ। যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

লোকজনের শব্দে পাহাড়ের একপাশে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। একদল শ্রমিক অবিরত কাটছে পাহাড়ের মাটিগুলো। দেখেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। চিনামাটির এই খনিগুলোকে কি না কাটলেই নয়?

গোপাল জানালো কিছু তথ্য। ১৯৫৭ সাল থেকে নাকি এই মাটি উত্তোলনের কাজ চলছে। সর্বপ্রথম কোহিনুর এলুমিনিয়াম ওয়ার্কাস নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই সাদামাটি উত্তোলনের কাজ শুরু করে। সরকারের অনুমতিতে বর্তমানে ৯টি কোম্পানী প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক দিয়ে প্রতিদিন এই মাটি উত্তোলনের কাজ

করাচ্ছে। গোপালের কথায় আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এভাবে কাটতে থাকলে একসময় এদেশে কি কোন পাহাড় মিলবে?
মনের আগুনে ঢালি পানি। সাদা পাহাড়ের উপরে বসে সবাই মিলে মেঘালয়ের পাহাড় দেখি। ইস্ , যদি ঐ পাহাড়টায় যেতে পারতাম। নানা ইচ্ছা আমাদের মনে বাসা বাধে।
এবার ফিরতে হবে। সাদা পাহাড়টিকে বিদায় জানাই আমরা। মনে মনে রবিকে খানিকটা ধন্যবাদ জানাই। আজ না আসলে হয়তো এই পাহাড়টিকে কখনই দেখতে পেতাম না। ওইদিন বিকেলেই আমরা ফিরতি পথ ধরি।
এখনও আনমনে ভাবি দীপচর আর সাদা পাহাড়ের কথা। সোমেশ্বরীর জলের স্পর্শ আজও আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়, হাতছানি দিয়ে ডাকে মেঘালয়ের ছবির মতো পাহাড়গুলো।

~ তথ্য - দীপচর ~ দীপচরের আরো ছবি ~

সমাজমনস্ক লেখক ও গবেষক সালেক খোকনের প্রকাশিত বই 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে আদিবাসী', 'কালপ্রবাহে আদিবাসী', 'রক্তে রাঙা একাত্তর'। ভালোবাসেন ছবি তুলতেও।

Rate This : - select -
Total Votes : 7
Average : 4.29

Like 24 people like this.

tell a Friend

Post Comments

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বসন্ত উৎসব, ভারতবর্ষ ও একটি ভূতের গল্প

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ তথ্য- শান্তিনিকেতন ~

তুমি ডাক দিয়েছ

না, সকালে নয়, বিশু পাগলের ডাকটা এল একেবারে মাঝরাতেই। মন দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য জায়গার বেড়ানোর একটা লেখা পড়ছিলাম। বইটা হঠাৎ বন্ধ করে ঘুমন্ত দীপকে ডেকে বললাম, শুনছ, আমি এই দোলে শান্তিনিকেতন যাব। পাশবালিশটা আরেকটু ভালো করে টেনে নিয়ে নির্বিকার ঘুমন্ত গলায় জবাব এল, "যাও"। বললাম, যাও মানে? - "যাও মানে যাও..."।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে আবার মনে পড়ল। বললাম, আমি কিন্তু সত্যিই দোলে শান্তিনিকেতন যাব, সিরিয়াসলি বলছি। দীপ বলল, "যাও না, কে বারণ করছে? আমিও সিরিয়াসলিই বলছি।" কিন্তু থাকব কোথায়? - আমি জানতে চাই, আরতো এক সপ্তাহই দেরি। -"সময় থাকতে বললে তো টুরিস্ট লজেই চেষ্টা করে দেখা যেত, এখন দেখি কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।" আমি কিন্তু বেশি টাকা-পয়সা খরচ করে যাব না - সোজা জানিয়ে দিই। যাবতো রবীন্দ্রনাথের কাছে, এই তো কত আর দূর শান্তিনিকেতন!

আমার বন্ধুস্থানীয় দুজনের কাছে খোঁজ নিই যাদের রুটিরুজি এই ভ্রমণকে ঘিরেই - সস্তায় কোথাও ঘর পাওয়া যাবে কীনা? একজনের সোজা উত্তর, নো ম্যাডাম। আরেকজন বলল, দেখছি। কিন্তু কয়েকদিনের চেষ্টায় সে যা খোঁজ দিল তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ। বললাম, থাক যাব না। দীপও টুকটাক যা খোঁজ নিল তার কোনটাই আশাপ্রদ নয়। তারপর বলল, ওদের ফোটোগ্রাফির গ্রুপটার কয়েকজনও দোলে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পরিকল্পনা করছে, ওরা যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।

বুধবার সাতাশ তারিখ দোল। সোমবার রাতে প্রবীরদার ফোন এল - একটা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে, মাটির ঘর - ওতেই মেয়েরা মানে আমি আর আমার কন্যা থেকে যাব, বাকি সবাই বাইরের দাওয়ায় শোবে। দীপ বলল, কী করবে? বললাম, চলতো। তেঁতুল পাতা যখন জুটেই গেছে ওতেই সকলের হয়ে যাবে - ওই ঘরেই এদিক-ওদিক করে সবাই ধরে যাব, শোওয়ার জায়গা না হলে আড্ডা দিয়েই রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে...।

জনতা জনার্দন

বেলা আড়াইটের সময় মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নিতেই দৌড় দৌড় দৌড় - ট্রেন বিকেল চারটে চল্লিশ। প্রবীরদারা তিনটে পঞ্চাশের ট্রেনেই রওনা দিয়েছে - ফোনে জানিয়েছে টিকিটের লম্বা লাইন পড়ছে। বড়বাজারের জ্যামে হোঁচট খেতে খেতে প্রায় পৌনে চারটে নাগাদ হাওড়া পৌঁছে দেখি জনসমুদ্র, আর তার একটা বড় অংশেরই গন্তব্য বোলপুর। বিশু পাগলের আক্কেলটা সত্যি কী, এতো প্রায় বাঁক কাঁধে নিয়ে ভোলেবাবার দর্শনার্থীর ভিড়! শুধু শিব ঠাকুরের বদলে রবি ঠাকুর। টিকিট কেটে আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দেখি বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ঢুকছে আর দরজাগুলো লক্ষ করে ছুটছে মানুষ। আমিও ছুটি মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে, বলি খবরদার হাত ছাড়াসনি যেন। চোদ্দ বছরের মেয়ে বলে, ওকে ওকে, আই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ। সত্যিই তাই, প্রচণ্ড ভিড় আর ঠেলাঠেলিতে আমার হাত আলগা হতেই দেখি বাবার ক্যামেরা কাঁধে ও উঠে পড়েছে। দীপতো আগেই বড় ব্যাগটা শুদ্ধু ঢুকে গেছে। আমার সামনে ওড়না, পিছনে সাইড ব্যাগ - কোনটা সামলানো সম্ভব ভাবতে ভাবতেই দেখি জনতা জনার্দনের প্রবল চাপে আমি ট্রেনের কামরার ভেতরে। একমুহূর্ত মাথাটা কেমন ধাঁধাঁ হয়ে গেল - তাকিয়ে মেয়ে-বাবা কাউকেই দেখতে পাই না, শুধু অজস্র মানুষ। মেয়ের ডাকে খেয়াল পড়ে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দীপের ব্যাগ দিয়ে রাখা জায়গায় ধপাস করে বসে পড়ি। লোকে দেখি সশরীরে কামরায় ঢোকার আগে জানলা দিয়ে রুমাল ছুঁড়ে জায়গা রাখছে, বোঝ! তো সেইসব অশরীরী রুমালটুমাল সরিয়েই দীপ জায়গা করে নিয়েছে। আমরা মা আর মেয়ে তিনজনের সিটে তৃতীয় আর চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে বসি, দীপ দাঁড়িয়ে থাকে। কামরার চতুর্দিকে জায়গা রাখা নিয়ে নানান গোলমাল-ঝগড়াঝাঁটি চলছে... ট্রেনও চলতে শুরু করে।

হোলি হ্যায়

শান্তিনিকেতন একবারই গেছি, তাও অনেকদিন আগে, কী একটা পরীক্ষা দিতে। সেবারে ঘোরা হয়নি। তাই ভাল করে তেমন মনেও নেই। কিন্তু শান্তিনিকেতন নামটা শুনলেই কেমন একটা রোমান্টিক চিত্র চোখে ভেসে ওঠে। বোলপুর স্টেশন থেকে বেরোতেই লোকজন-রিক্সার ডাকাডাকি সব ছাপিয়ে কানে এল মাইকের প্রবল নিনাদ - হিন্দি গানের সুর - হোলি হ্যায় - হায় রবীন্দ্রনাথ!

আজ জ্যোৎস্না রাতে

দুটো রিক্সাকে আড়াইশো থেকে একশো ষাটে নামিয়ে আমরা রওনা দিলাম ত্রিশুলাপট্টির দিকে। স্টেশনের কোলাহল পেরিয়ে পথ ক্রমশ শান্ত হয়ে এল। আকাশে প্রায় গোল থালার মতো চাঁদ - কাল দোলপূর্ণিমা। মনে পড়ছিল অনেকদিন আগে হোস্টেলে থাকতে হঠাৎ করে মৌসুমীদির সঙ্গে এক সন্ধ্যায় ওদের বাড়ি মুড়াগাছায় যাওয়ার কথা। সেদিনও ট্রেন থেকে নেমে এরকমই এক জ্যোৎস্নারাতে রিক্সায় চড়ে দু'জনে যাচ্ছিলাম। সময়ের দূরত্বে কে কোথায় পৌঁছেছি কে জানে, শুধু মৌসুমীদির দেওয়া ডাইরির পাতার লাইনগুলো আজও বলে - পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী...ভাবতে ভাবতে কখন দেখি পৌঁছে গেছি ত্রিশুলাপট্টি দুর্গামন্দির চত্বরে। প্রবীরদা অপেক্ষা করছিল। আমরা পৌঁছতে দীপের রিক্সায় উঠে পড়ে পথনির্দেশ করে।

এই যে কালো মাটির বাসা

উলগা বা উলগানাথনকে আমি বা দীপ কেউই চিনতাম না, প্রবীরদা আর শিবাজির পরিচিত। উলগাদের দেশ একসময় ছিল বিহার, এখন বহুদিনই শান্তিনিকেতন। উলগার বাবা খুব ফুটবল খেলতে ভালবাসতেন। তাই ছেলের নাম রেখেছিলেন উলগানাথন। রাইস মিলের বড় পিলারটা পেরিয়ে উলগার দাদা-বৌদির টালির চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। একটাই ঘর আর আরেকটা রান্নাঘর। বাড়ির সবাই যারপরনাই কুণ্ঠিত, আপনাদের খুব কষ্ট হবে... আমরাও বিব্রত হই। মাথা ঝুঁকিয়ে টালির চালের নীচু অংশ সাবধানে এড়িয়ে ঘরে ঢুকে চৌকিতে বসি। দুটো-তিনটে ইঁট দিয়ে উঁচু করা চৌকির নীচে সংসারের হাঁড়ি-কুড়ি, বাক্স-প্যাঁটরা। দড়িতে কয়েকটা জামা-কাপড় ঝুলছে। মাথার ওপর টালির ছাদ মাঝে মাঝেই ভেঙ্গে গেছে। দেওয়ালে একপাশে ঠাকুরদেবতার ক্যালেন্ডার কাটা ছবি আটকানো। আরেকদিকে বলিউডের অভিনেত্রী দিব্যার বড় সাইজের একটা ছবি। দাদা-বৌদি আর ওদের ছোট মেয়ে বছর বারোর পূজার সঙ্গে পরিচয় হয়। পূজার সঙ্গে অল্পসময়েই আমার মেয়ের ভাব হয়ে যায়। ছোটদের সখ্যের মজা এটাই যে ওরা অনেক সহজভাবে মিশতে পারে। আর সে কেবল বড় হয়নি বলেই।

রান্নাঘরে মোড়া পেতে বসে স্টিলের কাপে অনেকটা চিনি দেওয়া গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বৌদির সঙ্গে আলাপ জমাই। পাম্প করা স্টোভের ওপর বড় হাঁড়িতে ভাত বসেছে। ভাতের হাঁড়ির ওপর ডালের হাঁড়ি। বৌদি আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দুঃখ করেন - আমাদের পাকা ঘরে থাকতে দিতে না পারার দুঃখ, সংসারের বোঝা বওয়ার দুঃখ, একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া না শেখাতে পারার দুঃখ...। কথায় কথায় জানতে পারি চালের মিলে কাজ করার সময় অ্যাক্সিডেন্টে দাদার দুটো পা-ই ভেঙ্গে গিয়েছিল। অনেক টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে এখন হাঁটতে চলতে পারেন কিন্তু কাজটা আর নেই। ওই মিলেই এখন বৌদি একটা কাজ করেন। খুব ইচ্ছা ছিল ছেলেকে মাধ্যমিক অবধি পড়ানোর। ক্লাস নাইনে উঠেছিল, তারপরে বাবার এই অবস্থা। ছেলেও একটা মিলে চাকরি পেয়েছিল কিন্তু এতদিন সেই মিল বন্ধ ছিল, সবে সাতদিন হল ফের চালু হয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটজন ক্লাস সিক্সে পড়ে। দাদা এসে বৌদিকে বকেন, কী সব বলছ দিদিকে - ওনারা কতদূর থেকে এসেছেন তাড়াতাড়ি রান্না কর। ভাতটা দেখ যেন গলিয়ে ফেল না। এই চালে করনাতো। ডালটায় টমেটো দিয়ে ভালো করে ফোটাবে। ডিমের ঝোলের পেঁয়াজগুলো ভালো করে কষবে। শশা এনে রেখেছি একটু স্যালাড করে দেবে। বৌদি বলেন, টমেটোতো আনোনি, যাও এখনি সাইকেল নিয়ে। দাদা যাচ্ছি বলে এবার গল্প জুড়ে দেন, এখানকার জমিজমার দাম আগুন হয়ে গেছে, বাইরে থেকে লোকজন এসে জমি কিনে নিচ্ছে, নানারকম রাজনীতির খেলা চলছে...কড়াতে ডিমের ঝোল ফুটতে থাকে।

www.amaderchhuti.com

যাঁ, এঁইবাঁরের মঁতো তোঁকে ছেঁড়ে দিঁলাম...

পাড়াটার একেবারে শুরুতে উলগার এই দাদা-বৌদির বাড়ি আর মাঝের পুকুরটা পেরিয়ে একেবারে শেষের দিকে বড় দিদি-জামাইবাবুর পাকা ঘর। ওদেরই ছাদে তোষক-চাদর বিছিয়ে প্রবীরদারা তিনজন আর দীপের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। ছাদে কিছুক্ষণ আমরা মা-মেয়েও আড্ডা জমাই। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে গোটা ছাদ, পিছনের মাঠ-বাড়িঘর। প্রবীরদা বেড়ানোর চমৎকার সব গল্প বলেন। শিবাজি গান গাইতে একটুও রাজি না হয়ে বলে তোমরা কেউ ভূত দেখেছ? প্রবীরদা বলেন, কেন তুই দেখেছিস নাকি? হ্যাঁ দেখেছি মানে অনুভব করেছি, শিবাজি উত্তর দেয়। এর পরেরবার আমাকে একটু দেখাসতো, আমি সঙ্গে একটা শিশি নিয়ে যাব, ভূতকে নিংড়ে খানিকটা তেল বের করে নিয়ে আসব। শিবাজির মুখটা ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যায় - ওইরকম পরিস্থিতিতে যদি পড়তে, সেই শ্মশানে...। আমাকে শ্মশান দেখাস না তো, কত শ্মশানে ঘুরেছি, কোথাও আধখানা ভূতেরও দেখা পাইনি। আমি আসলে ভূতে বিশ্বাসই করি না। আমি মনে মনে ফিলোসফারের মত ভাবি, আসলে মানুষ ভয়তো পায় ভয়টাকেই, আর অন্ধকারকে, অজানাকে, একাকীত্বকে। এই সবগুলোই একসঙ্গে জড়ো হয়ে যেটা হয় তার নাম ভূত। অবশ্য আমি নিজেও তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে ফিলসফি বা লজিকের ধার ধারবনা তা বিলক্ষণ জানি। শিবাজির মুখটা ক্রমশ আলুর দমের মত হয়ে আসছিল। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাতে ভূতের গল্প দিব্যি জমবে - আমরা উৎসাহ দিই, বলো বলো। শিবাজি গল্প শুরু করে। তখন আমি বেশ ছোট, বছর দশ-বারো হবে। পুজোর সময়। গ্রামের একপ্রান্তে আমার মামার বাড়ি ছিল। একটা মাঠের ধারে ছিল শ্মশানটা। আমি একদিন ঘুরতে ঘুরতে কীভাবে পথ ভুল করে শ্মশানের দিকে এসে পড়েছি আর রাস্তা চিনতে পারছি না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গা টা কেমন ছম ছম করছে। হঠাৎ মনে হল আমি হাঁটছি আর আমার ঠিক পেছনে একটা খসখস করে শব্দ হচ্ছে। আমি থামছি, শব্দটাও থেমে যাচ্ছে। প্রবীরদা ফুট কাটেন, কুকুরের বাচ্চা। শিবাজি ভুরু কোঁচকায়, আবার গল্প শুরু করে। আমিতো ভয়ে আর পেছনের দিকে তাকাচ্ছিনা, শুধু ছুটছি। আমার পেছনের আওয়াজটাও ছুটছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ চোখে পড়ল চেনা গাছের সারি - এর ওপারেই মামার বাড়ি। গাছের সারিটা পেরোতেই কেউ একটা পিছন থেকে বলে উঠল - যাঁ, এঁইবাঁরের মঁতো তোঁকে ছেঁড়ে দিঁলাম... বলো, কুকুরে কখনও এটা বলতে পারে?

লাগল যে দোল

অচেনা পরিবেশে রাতে ঘুম খুব একটা গাঢ় হয়নি, সকালে অ্যালার্ম বাজার আগেই উঠে পড়ে দীপকে ফোন করি। ওরা যে বাড়িটায় আছে সেখানেই যেতে হবে বাথরুমে, তাই রাত সাড়ে চারটের সময় সঙ্গীর প্রয়োজন। সবাই মিলে তৈরি হয়ে বেরতে ছটা বেজে গেল। উলগা আর দাদার দেখানো পথে শর্টকাটে মাঠ-ছোট পাঁচিল ডিঙিয়ে পৌষ মেলার মাঠের দিকে জনতার স্রোতের সঙ্গে হাঁটা দিই। শিবাজি আর প্রবীরদার ক্যামেরার ফ্রেমে মানুষ, একা রেললাইন, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ঠাকুরের ভাঙ্গা কাঠামো। দীপও ক্যামেরা বের করে।

এবারই প্রথম বসন্ত উৎসবের স্থান বদল হয়েছে আশ্রম মাঠের থেকে পৌষ মেলার মাঠে। পৌঁছে দেখি এও সত্য এক মেলা, মানুষের মেলা...। পায়ে হেঁটে, স্কুটার-মটোরসাইকেল, সাইকেলে চেপে লোকজন আসছে। মাঠের শুরুতে সুলভ শৌচাগারের পাশে বেশ কয়েকটা অমুক ট্রাভেলস, তমুক ট্রাভেলস লেখা বড় বড় ভলভো বাস দাঁড়িয়ে। বাসের পিছনে চলছে রান্নার আয়োজন। নানা রঙের ভিড়ে বাসন্তী রঙটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে। মহিলাদের কারোর কারোর মাথায় ফুল, পলাশের মালা। কেউ কেউ আবির মাখতে আর মাখাতেও শুরু করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে একটা জমজমাট মেলার মেজাজ। বেলা বাড়ছে, রোদও চড়ছে একটু একটু করে। মাইকে মাঝে মাঝে নানারকম অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। তারপরে একসময় ভেসে আসে - ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল।

দূরে স্টেজ দেখা যায় কী যায় না, সামনে জনসমুদ্র। দীপ বলে যা ভিড়, এখান থেকে কিছুইতো দেখতে পাবেনা, বুইয়ের দিকে কিন্তু খেয়াল রেখো। মনে

মনে ভাবি বিশু পাগল যদি শেষমেষ এতদূর টেনেই এনেছে তখন বাকীটাও সেই দেখবে, আমার আর চিন্তা কী। মুখে বলি দেখিই না চেষ্টা করে, মেয়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরি। সে বলে, ডোন্ট ওরি মম, আই উইল নট গেট লস্ট, আই প্রমিস। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। দীপ হারিয়ে যায়।

চক্রব্যূহে অভিমন্যু

যত না বসন্তের ডাক কানে আসে তার থেকেও বেশি কানে বাজে, ও দাদা একটু বসুন না, সামনের লোক না বসলে আমরা দেখব কীকরে। মাঝে মাঝে এমন ঠেলা আসে যে ভাবি এই বুঝি ধপাস করে পড়ে গেলাম। সত্যি পড়ে গেলেনও একজন। বেশ বয়স্ক এক মহিলা। যে বয়সে কোন তীর্থের ভিড়ে উনি পড়ে গেলে আশ্চর্য হতাম না সেই বয়সে বসন্ত উৎসবে ওঁকে পড়ে যেতে দেখে অবাক হই, ভাবি কীসের আশায় উনি এখানে এই ভিড়ের মাঝে এসেছেন? কে জানে হয়তো বিশু পাগল ওঁকেও ডাক পাঠিয়েছিল। তবে ভিড় তাকে মাড়িয়ে যায় না বরং সহানুভূতির অনেকগুলো হাত টেনে তোলে। বাচ্চা কোলে মা ভিড়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে চলে। যে অনুষ্ঠান টিভি খুললেই দেখতে পাওয়া যায় তা দেখার জন্য কত দূর থেকে কতরকম মানুষ এসেছেন। ভিড়ের মাঝেই যেন একেকবার এক ঝলক বিশু পাগলকে দেখতে পাই। আবার অসহিষ্ণু মানুষের মাঝে হারিয়ে যায় সে। ঠেলাঠেলি, ঝগড়া কোথাও কোথাও মৃদু হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছায়। আবার আশপাশের মানুষজনই তাঁদের শান্ত করেন। জনতা জনার্দনের ঠেলায় কখন দেখি প্রায় বাঁশের বেড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ভিড়ের মাঝেই উলগার উদ্বিগ্ন মুখ উঁকি দেয় - বৌদি দেখতে পাচ্ছেন কিছু? আমি বলি পাব পাব, তুমি চিন্তা কোর না। সারাক্ষণই ও ফটো তোলা ছেড়ে আমাদের দিকে চোখ রেখেছে। মেয়ের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিই, আরেকটু দেখি, নইলে বেরিয়ে যাব। যদিও পিছন ফিরে বুঝি সামনে এগোনো যত কঠিন এখন পেছনো তার চেয়েও বেশি। আমরা একেবারে চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছি।

www.amaderchhuti.com

সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে

'ওরে গৃহবাসী' গানের সঙ্গে লাঠিতে তাল দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচের যে দলটা দুটো বাঁশের বেড়ার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রায় দেখিনি, রঙিন লাঠিগুলো মাঝে মাঝে একঝলক চোখে পড়েছে। গান শেষে নাচের দল চলে যেতেই লোকজন বেড়া টপকাতে শুরু করল। প্রথমে বেড়ার ওপর দিয়ে। আমরা যখন বেড়ার কাছে পৌঁছালাম তখন ওপারের লোকজন তারের জালি টেনে তুলছে আর এপারের লোকেরা নীচ দিয়ে গা-মাথা গলিয়ে দিচ্ছে। সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা ছেলেগুলো অসহায়ের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারের দলে উলগাও রয়েছে। আমরা মা-মেয়ে পার হই। পরের বাঁশও ডিঙিয়ে সামিয়ানার তলায় পৌঁছে মাঝামাঝি জায়গায় এসে একপাশে বসে পড়ি। এখান থেকে অনেকটাই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। বসে বসে গান শুনি - রঙ লাগালে বনে বনে...। কখনও নৃত্য-গীত দুইই দেখি-শুনি। লাল-সবুজ পাড়ের বাসন্তী রঙের, লাল পাড়ের সাদা শাড়িতে, ফুলের মালা গলায়, মাথায় দিয়ে আশ্রমের ছাত্রীরা আর সাদা পাঞ্জাবি রঙিন উত্তরীয়য় ছাত্রের দল মঞ্চে একের পর এক গানের সঙ্গে নেচে যায়। গানের মাঝে কবিতা পাঠ হয়। এরমধ্যেই পাশের বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে খানিক আলাপ জমিয়েছি। উনি স্থানীয় মানুষ। আমরা প্রথমবার এলাম শুনে আফশোস করছিলেন যে আসল বসন্ত উৎসবই আর দেখতে পেলেন না। তারপরে বলেন, ওই যে মঞ্চে বাঁদিকে যিনি বসে আছেন উনিই উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্ত। হঠাৎ খেয়াল হয় দীপকে একটা খবর দিই, আমরা দুজনে হারিয়ে গেলাম ভেবে যদি চিন্তা করে। আসলে আমরা দুজনে বেড়াতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই হারিয়ে যাই কীনা। আসার আগে পাখি পড়ানোর মত করে ত্রিশুলাপট্টি, দুর্গামন্দির বার বার করে বলে দিয়েছে। আমার আবার ছোট-খাটো কথা একদম মনে থাকে না। ফোন করতে গিয়ে দেখি মোবাইলে টাওয়ার নেই। এবার একটু ইতস্তত করে ওনাকেই বলি দাদা, আমার মোবাইলে টাওয়ার নেই, আমার হাজব্যান্ড চিন্তা করবেন, আমরা দুজনে ঢুকে এসেছি এতটা ভিতরে, যদি আপনার ফোন থেকে একটা ফোন করতে দেন। উনি নিশ্চয় নিশ্চয় বলে পকেট থেকে মোবাইলটা এগিয়ে দেন।

আমি অনেকবার চেষ্টা করে লাইন না পেয়ে ফোনটা ফেরত দিতে যাই। উনি বলেন আরেকটু দেখুননা চেষ্টা করতে করতে ঠিক পেয়ে যাবেন। আমি তাও পাইনা। কী আর করি ফোনটা ফেরত দিয়ে গানই শুনি-দেখি - আজই দখিন- দুয়ার খোলা...। ত্রিশুলাপট্টি-দুর্গামন্দির, এইতো দিব্যি মনে আছে। ওদিকে খেয়াল করে দেখি আমার নবলব্ধ দাদাটি প্রাণপনে আমার ডায়াল করা নম্বরটায় চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অবশেষে একটু বাদে হাসিহাসি মুখে ফোনটা এগিয়ে দেন আমার দিকে, নিন কথা বলুন - লাইনের ওপারে দীপের গলা ভেসে আসে। গানে-আওয়াজে প্রায় কিচ্ছু শোনা যায় না। তাও শেষপর্যন্ত বুঝি আর বোঝাই সেই সুলভ কমপ্লেক্স, বেলা সাড়ে নটা।

পৌনে নটা নাগাদ উঠে পড়ি। 'বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ' - অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে আসছে। শুরু হয়ে গেছে আবির খেলার পালা। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা, চেনা-অচেনা মানুষ সবাই রঙের উৎসবে মাতোয়ারা। লাল-সবুজ-হলুদ বেগুনি আবির উড়ছে বাতাসে। রঙ লেগেছে সবার চোখে-মুখে, মনের পর্দায়। ফেরার পথে ভিড় বেশ হালকা হয়ে গেছে। বাঁশের তলা গলে একই পথে বেরিয়ে এসে আবিরে রাঙানো মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকি। অচেনা মানুষ হাসি মুখে এগিয়ে আসেন, অনুরোধ জানান আবির মাখানোর। আমরাও আবির মাখতে মাখতে মাখাতে মাখাতে এগিয়ে চলি। কখন যেন বিশু পাগল আবার সঙ্গী হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে খানিক অপেক্ষা করতেই দীপকে দেখতে পাই। সবাই মিলে সরবত খাওয়া, আবির খেলা হয়। ওরই মাঝে আরও আরও অচেনা মানুষজন এগিয়ে আসেন আবির নিয়ে। কোন জোর নেই তাই কেউ এগিয়ে এলে নিজের থেকেই এগিয়ে যাই তার দিকে। আজ যে সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।

বন্ধুদের সঙ্গে রঙ খেলবি চল

আমাদের ফিরতে দেখে সবচেয়ে খুশি পূজা। বুইয়ের হাত ধরে টানে, চল, আমার বন্ধুদের সঙ্গে রঙ খেলবি চল। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, গোলাপী, বেগুনি - এতগুলো রঙের আবির একসাথে কখনও খেলেনি পূজা। বন্ধুদের আবির মাখায় যত ইচ্ছা। ওকে দেওয়া চকলেটগুলো নিজে একটুও না খেয়ে টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দেয় বন্ধুদের মধ্যে। হয়ত অনেকদিন ও বন্ধুদের দেওয়ার মত কিছু পাইনি। আজ সামান্য এইটুকু আবিরই ওর অনেকটা খুশি হয়ে বাতাসে ঝরতে থাকে। আমার মেয়েও খুব খুশি। ও কুকুর ভীষণ ভালবাসে। বাড়িতে পুষতে দিইনা বলে পাড়ার কুকুরদেরই আদর করে। কালকে রাতে এসেই ছাগলের বাচ্চা আর কুকুরের বাচ্চা কোলে নিয়েছে। এখনতো পারলে রাস্তায় আর পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়ানো ছোট ছোট হাঁস-মুরগীর ছানাগুলোর সঙ্গেও ভাব করে। আর ও-ওতো কখনও একসঙ্গে এত বন্ধুর সঙ্গে রঙ খেলেনি। কেউ ওর বয়সী, কেউবা একটু বড় বা ছোট। কারোর বিয়েই হয়ে গেছে, কোলে ছোট বাচ্চা। ভারী খুশি হয়ে আমায় এসে বলে আমি আজ এখানকার সব বন্ধুদের সঙ্গে খেলেছি মা।

www.amaderchhuti.com

রাঙিয়ে দিয়ে যাও

রোদের তেজ মরে আসছে। ব্যাগ গুছিয়ে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ি। বাকীরা কাল ফিরবে। সবাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বৌদিকে ডেকে তুলে বিদায় জানাই। মিস্টির প্যাকেট হাতে দিই, আর কী বা দিতে পারি? গতকাল প্রবীরদারা চাল-ডাল-ডিম সব কিনে এনেছিল বলে দাদা খুব রাগ করছিলেন। বলছিলেন, আমাদের বাড়িতে এসে আপনারা নিজেদের আনা খাবারই খাচ্ছেন, আমার মান-সম্মান আর কিচ্ছু রইল না।

বৌদিকে বিদায় জানিয়ে ফেরার পথে এগোই। হাঁটতে হাঁটতে মেয়ের বলা একটা কথা খুব সত্যি বলে মনে হয়। ওকে বলছিলাম, দেখছিসতো কত মানুষ কত কষ্ট করে বেঁচে থাকে। এটাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ। ও বলল, মা, ওরা কিন্তু খুব আনন্দেই আছে। এই আনন্দ অন্য আনন্দ যা শত দুঃখের মধ্যেও কোথাও একটা দাদা-বৌদি-পূজার মুখে দেখেছি। এটাই হয়ত ওঁদের বাঁচার রসদ। যে আনন্দের একটু ছোঁয়া হয়ত আমার বুকেও লেগেছে আর অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে আমার মেয়ের মুখের আলোতে।

এগিয়ে চলি - আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে...।

~ তথ্য- শান্তিনিকেতন ~

'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন দৈনিক 'কালান্তর', 'স্বর্ণাক্ষর' ও 'আজকাল' প্রকাশনার সঙ্গে। পাশাপাশি দীর্ঘ দিন ধরে মুক্ত সাংবাদিকতা করছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

মেঘ কুয়াশায় একা একা এলোমেলো

তুহিন দাশ খোকন

~ দার্জিলিং-কালিম্পং-লাভার তথ্য ~ দার্জিলিং-এর আরো ছবি ~

বাইরে ছাইরঙা বিকেল। কম্বলের ভেতর থেকে শুধু মাথাটা বের করে জানলার দিকে তাকালাম। আকাশে মেঘ আছে কিনা বুঝলাম না। সস্তা হোটেল, রুম হিটারের ব্যবস্থা নেই। শার্শি বন্ধ থাকলেও এমন শীত করছে যে মনে হচ্ছে প্রবল জ্বর এসেছে বুঝি! একেবারেই ভালো লাগছে না। গ্যাংটক যেতে না পারার দুঃখটা বার বার বুকে মোচড় দিচ্ছে। ধীরে ধীরে বাইরের ছাইরঙা বিকেলটা মরে পোড়া কয়লার মতো হয়ে এলো,ভেতরের বিরক্তি আর গোপন অবসাদ নিয়ে বিছানা ছাড়লাম। কলকাতার আদিবাসিন্দা জানা বাবুর হোটেলে উঠেছি আজ দুপুরেই। শিলিগুড়ি থেকে যে জিপে দার্জিলিং এসেছি তারই ড্রাইভার শচিন এই হোটেলের সন্ধান দিয়েছে। স্নান সেরে ভারী জামা কাপড় চাপিয়ে বাইরে বেরোলাম।

ম্যাল-এ রোদ পড়ে এসেছে। লোকজনের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাঙালি যুবতীকে দেখতে পেলাম। একটা আধভেজা ঠাণ্ডা বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালাম। যা ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে এই মুহূর্তে খানিকটা ব্র্যান্ডি পেলে ভালো লাগতো; কিন্তু সূর্যাস্তের ঠিক আগে এই মুহূর্তটাতে লিকার শপে ঢুকতে ইচ্ছে হলো না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লাল আকাশটার কোনো একদিকে সূর্য! এই সময় সূর্যের রশ্মিগুলো আলাদাভাবে দেখতে পাওয়া যায়। একটু কল্পনা করলাম - সন্ধ্যা বেলার সূর্য থেকে অসংখ্য লাল রঙের স্বপ্ন পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে মনে হলো।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ বসা গেল না। শচিনের নির্দেশিত পথে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় খুঁজে পেলাম শিরিং এ্যামোদের উডেন হোম কাম রেস্টুরেন্ট। বিশ বছর বয়সী সুন্দরী নেপালি যুবতী শিরিং শিলিগুড়ির এক নার্সিং হোমের ছাত্রী, শচিনের কাজিন। যে ক'দিন দার্জিলিং আছি এখানেই সস্তায় খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নেপালি এই পরিবার গত বিশ বছর যাবত দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। শিরিংয়ের মা হাউজ ওয়াইফ, বাবা জিপ ড্রাইভার। বড়বোনের বিয়ে হলেও ছেলেপুলেসহ সে এখন বাপের বাড়িতেই। আধ কাঠা জমির ওপর কাঠের নির্মিত ডুপ্লেক্স বাড়িটাই এদের বাসস্থান ও অর্থ উপার্জনকেন্দ্র। ভর সন্ধ্যাবেলাতেই ডিনার সারলাম প্রচণ্ড ঝাল দেওয়া চিকেন ও চীনে মূলার সালাদ দিয়ে। অ্যাডভান্স দেওয়া ছিল, খাওয়া শেষে শিরিংয়ের বড় বোন ডেজার্ট হিসেবে নিয়ে এলো ছোট্ট গ্লাস ভর্তি ঘরে তৈরি ওয়াইন। আমার ইতস্তত ভাব দেখে হিন্দি ভাষায় সে যা বোঝালো বাংলা তর্জমা করলে তার অর্থ দাঁড়ায় - 'ইহা পান করিলে খাদ্য ভালো হজম হইবে, শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইবে, প্রাতঃকৃত্যে স্বস্তি লাভ করা যাইবে...'। এত গুণাবলী বিশিষ্ট তরল পান না করে পারা যায়! আগ্রহ ভরে গলায় ঢাললাম; তরল আগুন জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল পেটে। নির্মাতা অর্থাৎ শিরিংয়ের বোন সাংকেতিক ভ্রূ উঁচিয়ে 'কেমন' জানতে চাইলে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুল এক করে সন্তুষ্টির সিগনাল দিলাম, যদিও ততক্ষণে বিস্বাদে ছেয়ে গেছে ভেতরটা। শুভ রাত্রি জানিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভেতর কুঁজো হয়ে দ্রুত হাঁটলাম। হোটেলে ঢোকার মুখেই জানা বাবু ধরে বসলেন,'আরে মশাই এই সন্ধ্যা বেলাতেই (তখন রাত আটটা) ঘুমাবেন কী, আসুন একটু গল্পসল্প করা যাক। অনেকদিন পর একজন বাংলাদেশি ভাইয়ের দেখা পেলাম। 'অনেকদিন'-প্রশ্নবোধক চোখে তাকাতেই জানা বাবু জানালেন দার্জিলিং এখন বড্ড অশান্ত। পৃথক প্রাদেশিক সরকারের দাবিতে গোর্খারা প্রায়শই বন্ধ ডাকছে। খুনোখুনিও হয়ে গেছে বেশ কয়েকটা। সব মিলিয়ে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। মনে মনে আমার শঙ্কিত হয়ে ওঠাকে লক্ষ্য করে তিনি জানালেন যে বিদেশি বোর্ডার হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনি আমার পাসপোর্ট কপিসহ অন্যান্য তথ্য স্থানীয় থানায় জমা দিয়েছেন নিরাপত্তার খাতিরে। এসময় মি.সিন্‌হা (নামটি যদিও পরে জেনেছি) ঢুকলেন হাতে হুইস্কির বোতল নিয়ে। পরিচয় পর্ব শেষে জানতে চাইলেন দার্জিলিংয়ে এই প্রথম কিনা? জানালাম এ নিয়ে তৃতীয়বার। দার্জিলিং কি খুব ভালো লাগে জানতে চাইলে তাকে গ্যাংটক ভ্রমণের বিফল নাটকটি সংক্ষেপে বললাম। মি.সিনহা প্রস্তাব দিলেন যে উনি অনায়াসেই আমাকে গ্যাংটক নিয়ে যেতে পারবেন। উৎসুক হলাম, জিজ্ঞেস করলাম কীভাবে। উত্তরে তিনি যে উপায় বললেন তা মোটেও পছন্দ হলো না আমার। পরিবর্তে আমার অদেখা কোনো জায়গায় নিয়ে যাবার অনুরোধ করলাম। এ জায়গা ও জায়গা হয়ে শেষে কালিম্পং ও লাভার কথা এলো। এর মধ্যে মি.সিন্‌হা লাভার যে বর্ণনা দিলেন তাতে তখনই রওনা হতে ইচ্ছে হলো। অবশেষে ঠিক হলো আগামীকাল সকাল ন'টা নাগাদ রওনা হবো। হোটেল রুম দু'দিনের জন্যে বুকিং ছিল। তাই জানা বাবু খানিকটা বুঝি অসন্তুষ্টই হলেন একদিনের বুকিং বাতিলের কারণে; বিশেষতঃ এখন যখন পর্যটকের ভয়াবহ সংকট।

রুমে ফিরে জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে পুরু কম্বলের তলায় ঢুকলাম। চোখ বুজলাম ঘুমাবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঘুম আসছে না। শুধু এলোমেলো ভাবনা বিপুল জলরাশির মতো ভিড় করছে মাথায়। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ইন্টারকমের জোরালো আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। বেলা আটটা বেজে গেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নামতেই জানা বাবু জানালেন মি.সিনহা বিশেষ কাজে কলকাতা গেছেন। অবশ্য চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ জানা বাবুই আমার লাভা ও কালিম্পং যাবার বন্দোবস্ত করেই রেখেছেন। সাড়ে ন'টায় আমার জন্য নির্ধারিত গাড়ি আসবে,আমি যেন তার আগেই ব্রেকফাস্ট সেরে আসি। সকালের ধোঁয়াশে দার্জিলিং ভেদ করে যখন শিরিংদের রেস্টুরেন্টে পৌঁছলাম তখন তাদের রুটি বানানো শেষ হয়নি। মিনিট পনের তাই বসতেই হলো। নাস্তা সেরে বিদায় নেবার সময় এই নেপালি পরিবারের নিখাদ আন্তরিকতা হৃদয় ছুঁলো আমার। শিরিংকে সাথে করে কাছের সুভেনির শপে গেলাম;

www.amaderchhuti.com

দোকানগুলো তখন সবেমাত্র খুলছে। মাঝারি দামের এক সেট স্টোনের অর্নামেন্ট গিফট দিলাম শিরিংকে। তার চোখের কোণ তখন চিকচিক করছে; বিদায় নিলাম, জানি না আর কখনও দেখা হবে কিনা।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় রওনা হলাম কালিম্পং-এর উদ্দেশ্যে। সতের'শ রুপির চুক্তিতে দার্জিলিং-কালিম্পং-লাভা-কালিম্পং। দার্জিলিং থেকে সড়ক পথে কালিম্পং-এর দূরত্ব পঞ্চান্ন কিলোমিটার। উঁচু নীচু পাহাড়ি পথ। মেঘমুক্ত দিন তাই প্রায় মিনিট দশেক ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের সঙ্গী হল - বরফশুভ্র চূড়া মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে সূর্যের তির্যক রশ্মি লেগে। মিনিট পনের পরে ড্রাইভার একটি ছোট্ট হিল স্টেশনে চা বিরতি দিলো। অনেকটা টং-ঘরের স্টাইলে নির্মিত টি স্টলের জানলার ধারে বসেছি। ঘনদুধের চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে আশপাশের জঙ্গলের নিবিড় সবুজ দেখতে লাগলাম। চড়া রোদের কারণে ঠাণ্ডা ভাবটা অনেক কমে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তের অনুভূতি আসলে ব্যাখ্যাতীত। আমি একা, সুবিশাল এ পাহাড়ি অরণ্যে; এই নিঃসঙ্গতাই অদ্ভুতভাবে ভালো লাগতে লাগলো।

বিরতি শেষে গাড়ি আবার চলা শুরু করলে পিছনের সিটে হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ড্রাইভারের ডাকাডাকিতে চোখ মেলে দেখলাম খুব বেশি চওড়া নয় এমন চারটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে গাড়ি দাঁড়িয়ে। আশেপাশে আরও অনেকগুলো গাড়ি, দোকান পাট, মানুষের ভিড়। জিজ্ঞেস করে জানলাম এটাই কালিম্পং-এর বাসস্ট্যান্ড। কালিম্পং-এর বিভিন্ন গ্রাম এখান থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে নানান দিকে। গাড়িতে তেল ভরতে হবে এখানে। পেটেও খিদে জানান দিচ্ছে। তাই ভেজিটেবল রোল ও খানিকটা চাউমিন সহকারে লাঞ্চ সারলাম। তারপর প্রথমে ফ্লাস্কের গরম জলে তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। একেবারে তরতাজা অনুভূতি হলো।

আমার গন্তব্য কালিম্পং-এর পঁয়ত্রিশ মাইল পূর্বের পাহাড় চূড়া 'লাভা'। দু'পাশে ঘাসের সবুজ গালিচা সদৃশ ক্ষুদ্র প্রান্তর - মাঝে সাপের মতো লকলকিয়ে উঠে গেছে পিচ ঢালা মসৃণ কালো রাস্তা। পুরোটা পথই একেবারে খাড়া উঠেছে লাভা অব্দি। বাইরে থেকে যা দেখলাম তাতে লাভাকে পাহাড় চূড়ার একটি উদ্যান মনে হলো। টিকিট কেটে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঢুকেই নিঃশ্বাস আটকে গেল রকমারি পুষ্প উদ্যানের শোভা দেখে। দেশি-বিদেশি অজস্র ফুলের গালিচা কেউ যেন বিছিয়ে রেখেছে পার্কওয়ের দু'পাশ জুড়ে। একটু উঁচুতে হেঁটে উঠে দেখলাম সবুজ ঘাসে মোড়া ছোট একটি মাঠ যার একপাশে টিউডোর রিভাইভাল আর্কিটেকচারে গড়ে তোলা তিন তলা একটি হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট। প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্যের একপাশে এই একমাত্র মূর্ত দালান যা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। যদিও থাকবার কোন সুযোগ নেই,তাও স্রেফ কৌতুহলে হোটেলটিতে ঢুকলাম। স্কটিশ ঢঙে ইন্টেরিয়র করা চমৎকার ভেতরের পরিবেশ। সময় স্বল্পতার কারণে একটু পরেই চলে এলাম আবার উদ্যানের মাঝে। হাঁটার জন্যে উন্নত পেভিং ব্লকে নির্মিত ওয়াকওয়ে, দু'পাশে উজ্জ্বল রঙের ফুলের গাছ। আর তারই মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ ফার ট্রির সমারোহ। এবার আসা যাক লাভার আসল সৌন্দর্যের বর্ণনায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে লাভার উচ্চতা ও সূচালমুখী গঠন আয়তনের কারণে বাতাসের চাপ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। ফলে মেঘের দল প্রায়শই থাকে হাতের নাগালে। কখনও কখনও পা ছুঁয়ে যায়। লাভাকে এক কথায় মেঘরাজ্য বা মেঘকন্যাও বলা যায়। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে পার্কের বেঞ্চের আশেপাশে ভাসতে থাকা কয়েকটি মেঘের মধ্যে ঢুকে গেলাম। পরক্ষণেই বেড়িয়ে এলাম স্যাঁতস্যাঁতে অনুভূতি ও লেপটানো কাপড় নিয়ে। খেলাটা বেশ জমে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। পাহাড়ের চূড়া বেয়ে ধীরে ধীরে মেঘেরা উঠে আসে উদ্যানে আর সে মেঘের মাঝে ডুব দিই আমি। বেড়াতে আসা আশেপাশের অনেক তরুণ তরুণীও আমার দেখাদেখি এই মেঘস্নানে যোগ দিলো। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ছবি তোলা হলো। তারপর পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে ধোঁয়াশে আকাশ দেখতে লাগলাম।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না,ড্রাইভার এসে ডাকতেই ঘড়ি দেখলাম,বেলা তিনটা। সমতলে অর্থাৎ শিলিগুড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। ড্রাইভারের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মূল ফটকের কাছাকাছি। এতক্ষণ যা চোখে পড়েনি এবার তা দেখলাম। বামদিকে ঢালুতে বিশাল এক কৃত্রিম জলাশয়,যদিও বৃষ্টির অভাবে জল তখন নিঃশেষ প্রায়। পাড়ের কাছে ছোট ছোট রঙিন বোট দেখে বুঝলাম এখানে রাইডিং-এর ব্যবস্থাও আছে।

ফিরতি পথে কালিম্পং-এ গাড়ি বদল করে শেয়ার জিপে চড়ে যখন শিলিগুড়ি পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা নামছে তার অন্ধকারের পাখা মেলে। গতকাল রাতেই ফোনে টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই হাতে অঢেল সময় কাটাতে কিছু খুঁজে না পেয়ে দু'তিনটে শপিং মল ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কিছুক্ষণ সময় কাটালাম

www.amaderchhuti.com

সাইবার ক্যাফেতে। রাত আটটা বেজে এলে রিকশা ধরে পৌঁছে গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি ট্রেন স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মেই এক দোকান থেকে রুটি ও আলুর সুস্বাদু তরকারি সহযোগে ডিনার সারলাম। ডেজার্ট হিসেবে খেলাম দু'পিস পাহাড়ি মিষ্টি পেঁপে।

মধ্যরাত্রি উতরে গেছে কখন। লালচে আভার আকাশ দেখে ঝড় আসবে মনে হলো। প্ল্যাটফর্মে লোকের আনাগোনাও কমে গেছে। পাশের বেঞ্চে বসে থাকা কয়েকটি পরিবার গল্পরত, এলোমেলো হাওয়া তাদের আলাপচারিতার শব্দাংশ উড়িয়ে নিচ্ছে। অন্ধকারে কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎই নিজেকে খুব একা মনে হলো। মনে হল এভাবে নিঃসঙ্গ ঘোরার চেয়ে এবার থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ব। এসব ভাবতে ভাবতেই দেখি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে, প্রায়

আড়াই ঘণ্টা লেট।

জানালার ধারে বসে দেখলাম মেঘেদের ভিড়, জ্যোৎস্না রাত। অবতল চাঁদের ছেঁড়া ছেঁড়া জ্যোৎস্না। ট্রেন চলার ধারাবাহিক শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। শহরের কোলাহল এখানে পৌঁছোয় না।

www.amaderchhuti.com

~ দার্জিলিং-কালিম্পং-লাভার তথ্য ~ দার্জিলিং-এর আরো ছবি ~

মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মরত তুহিনের বেড়ানোর নেশা ছোটবেলা থেকেই। বড় হয়ে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ফটোগ্রাফিও। বই পড়া ও গান শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও করছেন বেশ কয়েকবছর ধরেই।

Rate   h s : - select -

Like 4 people like this.

www.amaderchhuti.com

tell a Friend

otal Votes : 8
– **verage :** 4.63

Post Comments

ছোট্ট টুপুরের বড় ট্রেকিং

ঝুমা মুখার্জি

গোমুখ-তপোবন ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি

পরপর দুবার মা-বাবা ছোট্ট টুপুরকে মামারবাড়িতে রেখে গেল পাহাড়ে হাঁটতে। পাহাড়তো বটেই, নদী,ঝরনা,ফুল আরও কতকিছু দেখে ফিরে এসে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পও বলেছে তাকে। তবু তাতে কি আর সত্যি সত্যি দেখা হয়? বড়রা কিচ্ছু বোঝেনা, খালি ছোটদের ছোটই ভাবে! আট বছরের টুপুর এবার কিন্তু আর মামার বাড়িতে থাকতে রাজি নয়, পুজোর ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ট্রেকিং করতে সে যাবেই যাবে। বড় হয়নি বুঝি সে!? ভূগোলে পড়েছে নদীর গতিপথ, উৎস, গঙ্গোত্রী হিমবাহর কথা। এবার নিজের চোখে দেখার সুযোগ সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। শারীরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি মানসিকভাবেও নিজেকে তৈরি করার কাজে চটপট লেগে গেল। প্রতিদিন মা-বাবার সঙ্গে হেঁটে নিজেকে তৈরি করল শারীরিকভাবে আর বাবার মুখে গল্প শুনে, ইন্টারনেটে ছবি দেখে মানসিকভাবেতো আগেই প্রস্তুত। পুজোর ছুটিতে তিনজনে মিলে যাবে গোমুখ-তপোবন। এর আগে সে দেওরিয়াতাল, সান্দাকফু এরকম ছোট ট্রেক করেছে কিন্তু হাই অল্টিচ্যুড ট্রেক কখনও করেনি। মা বেচারি প্রথমে একটু চিন্তাতেই ছিল,কিন্তু মেয়ের উৎসাহ দেখে আর না করতে পারেনি।

বর্ষা যাব যাব করছে, নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের মেজাজ, পাড়ায় পাড়ায় পুজোর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে, আমরা সেরকম এক সন্ধ্যায় কলকাতা ছাড়লাম, কোলাহল-মানুষের ভীড় থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কটা দিন কাটাব বলে। ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে আটটায় উপাসনা এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু। ন' ঘন্টা দেরিতে হরিদ্বার পৌঁছল ২৬শে দুপুর দেড়টায়। দুদিন ট্রেনে খেয়ে ঘুমিয়ে, বই পড়ে সময় কাটল। বিহার, ঝাড়খন্ডে প্রচুর বৃষ্টির জন্য সব ট্রেন দেরিতে চলছিল। এমন এক ট্রেনে চেপেছি যাতে জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমরা সঙ্গে অনেক খাবার নিয়েছিলাম তাই অন্তত শুকিয়ে মরতে হয়নি। তবে হরিদ্বারে পৌঁছে আমরা রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলাম। বাতানুকূল গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অনলাইন বন্ধু অর্থাৎ ট্যুর পরিচালক অপেক্ষা করছিলেন। সামনাসামনি সাক্ষাৎপর্ব মিটতেই গাড়ি ছাড়ল। ভীষণ গরম আর রোদ দেখে ভুলতে বসেছি মাসটা কী! হাতে সময় কম তাই লাঞ্চ করা হল না,কোল্ড ড্রিংকস,চিপস্ খেতে খেতে চললাম।

www.amaderchhuti.com

১৮০ কিমি রাস্তা যেতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগল, চা বিরতি বার দু'এক ছিল অবশ্য। আজকের রাত্রিবাস হোটেল শিবলিঙ্গ। দুদিনের পথশ্রমে আমরা বেশ ক্লান্ত, তাই প্রায় মশলাবিহীন, স্বাদহীন খাবার গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়লাম রাত দশটার মধ্যে।

গঙ্গোত্রী মন্দির

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে। দরজা খুলে বাইরে এসে থমকে গেলাম, কী ভীষণ সুন্দর জায়গা। সামনেই নদী আর চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। হাল্কা ঠাণ্ডা আর ভোরের নরম রোদ গায়ে মাখতে এ অক্টোবরে যে কী ভালো লাগছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসা ঘণ্টাধ্বনি আর নদীর বয়ে চলার শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। কী অপার্থিব শান্তি! জানিনা কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একে একে মেয়ে ও তার বাবা এসে দাঁড়াল,আমার ঘোর কাটল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তৈরি হয়ে আমাদের উত্তরকাশী ছাড়তে হবে। তার আগে শহরটা অবশ্যই ঘুরে দেখব। তাই আর দেরি না করে আমরা সাড়ে ন'টায় হোটেল ছাড়লাম। এখানে দর্শনীয় স্থান বলতে নেহেরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আর অসংখ্য মন্দির। পুরাণে কথিত আছে কাশী থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবতারা উত্তরে হিমালয়ে এসে বসতি শুরু করেন,সেই থেকে এই স্থানের নাম উত্তরকাশী হয়েছে। এই কাহিনি শোনালেন বিশ্বনাথ মন্দিরের পূজারী।

ভগবানের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে পোর্টার-গাইড সহ চারজন। এখান থেকে গঙ্গোত্রী ১০০ কিমি। ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা,সেইদিকেই চোখ আটকে আছে। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। মেরামতের কাজও চলছে তাই গাড়ির গতিবেগ খুব কম। গাড়িতে গাড়োয়ালি গান শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল টুপুর। ওদিকে অনর্গল কথা বলেও চলেছে। আসলে ও ভীষণ উত্তেজিত, বুঝতে পারছি। ঘন্টাখানেক পর ভাটোয়ারিতে গাড়ি কিছুক্ষণ থামল। তারপর সুখীগাঁও,ঝালা পেরিয়ে ধারালিতে না থেমে পারলাম না। ধারালিতে গাড়ি থামতেই মেয়ের খুশি দেখে কে? গাছ ভর্তি আপেল দেখে সে আনন্দে আত্মহারা। তখন ঘড়িতে ৩টে বাজে, সকালের খাবার কখন হজম হয়ে গেছে, এবার কিছু খেতে হবে। বেশ কিছু দোকানপাট, হোটেল চোখে পড়ল। কিন্তু এসবতো অন্য কথা, আসলে ধারালি অসাধারণ, অবর্ণনীয় - যাকে বলে নামী চিত্রকরের আঁকা ক্যানভাস। গঙ্গা তীব্রবেগে নেমে কয়েকটি ধারায় নিজেকে ভাগ করে হরশিল উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। নদীর ধার বরাবর প্রচুর আপেল গাছ,অনেক আপেল হয়ে আছে। মাটি থেকে কুড়িয়ে আপেল খাবার যে কী আনন্দ তা এখানে না এলে সত্যি জানতে পারতাম না। দেখি আপেল কুড়িয়ে টুপুরের হাতেও ধরিয়ে দিয়েছে আমাদের কোন এক সঙ্গী আর সেও খুশিমনে খেতে ব্যস্ত। নদীর জল মাথায় ছিটিয়ে একটু খেলাও হয়ে গেল ওরই ফাঁকে।

ধারালি ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। দুটোদিন প্রকৃতি দর্শন করে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সামনে অন্য হাতছানি তাই ঘন্টাখানেকের মধ্যে ছাড়তে হল এ জায়গা। ধীরে ধীরে রাস্তা আরও খারাপ হচ্ছে, এদিকে সন্ধের মধ্যে আমাদের গঙ্গোত্রী পৌঁছতে হবে,তাই আর থামা নয়। কিছুদূর যাবার পর দেখি জাহ্নবী নদী গঙ্গায় মিশেছে। লোহার পুল থেকে নীচে তাকালে গা ছমছম করে। পথে ভৈরবঘাটা মন্দির দর্শন করে ছটা নাগাদ গঙ্গোত্রী পৌঁছে গেলাম।

লাগেজ হোটেলে রেখে সোজা মন্দিরের রাস্তা ধরলাম। এখন প্রায় ফাঁকা, অল্পসংখ্যক পর্যটক চোখে পড়ল, তাও বিদেশি। হাতে গোনা কয়েকটি হোটেল-দোকান খোলা, মাসখানেক পর এগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে। বরফে ঢেকে যাবে এই জায়গা, ছ'মাস বন্ধ থাকবে মন্দির। ৩০৪২ মিটার উচ্চে অবস্থিত শ্বেতশুভ্র পাথরে

সোনালি শিখর শোভিত গঙ্গা মায়ের মন্দির। কথিত আছে, জলোচ্ছাস থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে মহাদেব এখানে বসেই জটায় রুদ্ররূপী গঙ্গার গতি রুদ্ধ করেন। আরতি শুরু হল মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই। মন্দিরের মঙ্গলময় পরিবেশে মন নিবিড় প্রশান্তিতে আপ্লুত, পরমেশ্বরের কাছে হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করি কিন্তু কিছু চাইতে পারি না, সবইতো দিয়েছেন। প্রাপ্তির ঝুলি উপচে পড়ছে - এই অনুভূতি কেন জানিনা হিমালয়ে না এলে হয় না। আজকের রাতটা এখানে বিশ্রাম, কাল থেকে শুরু হবে ট্রেক।

চিরবাসা

প্রথম দিন সকাল সকাল হাঁটা শুরু করব, এরকম ইচ্ছা ছিল। কারণ প্রথম দিন হাঁটার গতি কমই থাকে, তাছাড়া বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বেড়ে গেলে ক্লান্তিকর হয় হাঁটা। কিন্তু আমরা তৈরি হয়ে গেলেও সঙ্গীদের জন্য দেরি হল। শরতের নির্মেঘ আকাশ আর শ্বেতশুভ্র তুষারশৃঙ্গ হাতছানি দিচ্ছে অনেকক্ষণ। সাড়ে দশটায় আমরা মন্দির দর্শন করে পা বাড়ালাম। মন্দিরকে পিছনে রেখে বরফের টুপি মাথায় সুদর্শন পর্বতকে সামনে দেখতে দেখতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। টুপুরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই গাইড আঙ্কলের বেশ ভাব হয়ে গেছে। সবার আগে আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। আজ প্রথমদিন হাঁটায় ওর উৎসাহের মাত্রাটা একটু বেশি। শেষ ট্রেকিং-এ গেছে দু'বছর আগে সান্দাকফুতে।

প্রায় ১ কিলোমিটার হাঁটার পর গঙ্গোত্রী স্যাংচুয়ারিতে প্রবেশের অনুমতি নিতে হল। এখানে পরিমাণমতো অর্থ দান করে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দূষণের হাত থেকে হিমবাহ,অরণ্য,অরণ্যের বাসিন্দাদের বাঁচানোর জন্যই এই প্রয়াস। প্লাস্টিক বর্জিত এ জায়গা। তবুও যত্রতত্র বোতল,টফি,বিস্কুট ইত্যাদির মোড়ক পড়ে। মনে হল, যে প্রকৃতিকে দেখার জন্য আমাদের মত অনেক মানুষ ছুটে আসে কেন তারা এটুকু বোঝে না ধ্বংসের কবল থেকে প্রাকৃতিক এই সম্পদকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। দু কিলোমিটার হাঁটার পর বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড রোদে হাঁটতে টুপুরের বেশ কষ্ট হচ্ছে। রোদের খুব তেজ,আর জায়গাটাও ভীষণ রুক্ষ, বর্ষা বিদায় নেবার পর অনেকদিন বৃষ্টি নেই তাই গরম বেশ। শুধু টুপুর কেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি আমরাও। প্রচুর জল আর লজেন্স, ড্রাই ফ্রুটস খেতে আর খাওয়াতে শুরু করলাম।লম্বা রাস্তা হাঁটতে হবে, ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলবে না। পালা করে নানারকম গল্প শোনাতে শোনাতে, টুপুরের বিভিন্ন প্রশ্নের ক্রমাগত উত্তর দিতে দিতে আর কিছুক্ষণ পর পরই গলা ভেজাতে ভেজাতে আমরা হাঁটছি। আমাদের পাশে পাশে সশব্দে গঙ্গা বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝরনা পথ আটকাচ্ছে,ঠাণ্ডা জল মুখ -চোখে দিচ্ছি।

ভুজবাসা

গঙ্গোত্রী থেকে ভুজবাসা ১৪ কিমি দূরে। তাই আজ সারাদিন হেঁটে যেতে হবে। তবে দলের কনিষ্ঠ সদস্য যদি না পারে তবে ৯ কিমি দূরে চিরবাসাতে ক্যাম্পিং করতে হবে। কিছু দূর অন্তর অন্তর পাথরে লেখা 'রক ফল এরিয়া' - একদিকে যেমন বিপদের সাবধানবাণী অন্যদিকে তেমনি হিমালয়ের অকৃত্রিম রূপের হাতছানি। পথে কোন চায়ের দোকানও নেই বিশ্রামের জন্য,ঘন্টা দুয়েক হাঁটার পর আমরা বসে বিস্কুট,ফল,চানাচুর খেয়ে আবার চলা শুরু করলাম। দূরে চিরবাসা দেখা যাচ্ছে,এখন ২ কিমি যেতে হবে,ওখানে চা-ম্যাগি খাওয়া হবে।

চিরবাসা আসার পর সবুজের সান্নিধ্যে মনটা তাজা হল। চীর গাছে ঘেরা এস্থান মরুদ্যানের মত। চিরবাসায় পৌঁছে একটি বাঙালি দলের সঙ্গে দেখা হল। বেশিরভাগ যাত্রী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছেন। দলের বয়স্ক একজন সদস্য শ্বাসকষ্টে কথা বলতে পারছেন না। আমরা লজেন্স- ড্রাই ফ্রুটস দিলাম আর প্রচুর জল খাবার পরামর্শ দিলাম। আমাদের দলের ছোট্ট ট্রেকারকে দেখে এঁরা বেশ অবাক হয়েছেন। আমাদেরও দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে মন চাইছিল। কিন্তু এখানে অস্থায়ী চায়ের দোকান বন্ধ আর আমাদের কুক স্টোভ জ্বালাতে ব্যর্থ হলেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে হাঁটা শুরু করলাম। এখনও ৫ কিলোমিটার যেতে হবে। ধীরে ধীরে সূর্যের তেজ কমে আসছে,আর আমাদের হাঁটার ক্ষমতাও। শেষের দিকে রাস্তাও খারাপ হচ্ছে,মাঝে মাঝে পাথর গড়িয়ে পড়ছে ওপর থেকে। সূর্যাস্তের পর এই রাস্তায় হাঁটা বিপজ্জনক,তাই একটু পা চালিয়ে যেতে হবে। এদিকে খিদে ক্লান্তিতে পা অবশ হয়ে আসছে। ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে সন্ধের ঠিক আগে ভুজবাসা পৌঁছে গেলাম। অনেক আগে এখানে প্রচুর ভূর্জ গাছ ছিল তাই এজায়গার এই নামকরণ, তবে আজ তার কোন চিহ্ন নেই। আমাদের সঙ্গীরা ততক্ষণে তাঁবু খাটিয়ে গরম স্যুপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। এখানে থাকার জন্য লালবাবার আশ্রমও আছে,সেখানে আহার আশ্রয় দুইই মেলে। কনকনে ঠাণ্ডার দাপটে তাঁবুতে ঢুকতে বাধ্য হলাম । উচ্চতাজনিত কারণে কিছুই খেতে ইচ্ছে করলনা। টুপুরকেও রাতে কিছু খাওয়াতে পারলাম না, কোন খাবারই পেটে থাকছে না। তাঁবুতে থাকার অভিজ্ঞতা আমাদের দুজনের থাকলেও মেয়ের ছিলনা। তাই রাতটা বেশ উৎকণ্ঠায় প্রায় জেগেই কাটল।

সকালে বাইরে এসে চায়ে চুমুক দিতেই রাতের ক্লান্তি নিমেষে উধাও। রোজকার জীবনে দিনের শুরু থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়,ঘড়ির গতির সাথে তাল রেখে ছুটতে হয়। তাই সকাল-দুপুর- সন্ধ্যা হয় - দেখা হয়না কিছুই। প্রকৃতিও যে আলাদা আলাদা রঙে সাজতে পারে তা আমরা ভুলে যাই। সকালের ভুজবাসাকে নতুন রূপে দেখলাম। কাল অন্ধকারে চারপাশ দেখা হয়নি। দূর থেকে দেখা পাহাড়গুলো যেন হাতের নাগালে,আর তারই চূড়ায় সূর্যের আলোকপাত মনকে উদাস করে দেয়। সকালে রোদ ঝলমলে প্রকৃতি দেখে টুপুরতো খুব খুশি। ব্রেকফাস্ট করে সবার আগে তৈরি হাঁটার জন্য। ভাগীরথী পর্বতমালার ১,২,৩ শৃঙ্গ আর শিবলিঙ্গ আগামী পথের সঙ্গী। স্যাক নিয়ে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়ার ডাক আসে। আর অপেক্ষা নয়, ভুজবাসার স্মৃতি ক্যামেরা বন্দি করে যাত্রা শুরু করি।

আজকের পথ কিলোমিটার হিসাবে কম কিন্তু কঠিন। মেয়েকে নিয়ে একটু চিন্তায় ছিলাম, আদৌ তপোবন যেতে পারব কিনা জানিনা। পাঁচ কিলোমিটার পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে গোমুখ যাব, এখানে ক্যাম্প করা যায় না। তাই তপোবন যেতে না পারলে আমাদের আবার ভুজবাসা ফিরে আসতে হবে। অনেকেই ক্ষুদে ট্রেকারকে দেখছে, কেউ কেউ উৎসাহ দিচ্ছে। আজ প্রায় পুরো রাস্তা বোল্ডারের ওপর দিয়ে হাঁটা আমাদের হাত ধরে। ঘন্টা দুয়েক পর আমরা গোমুখ এসে পৌঁছলাম, দূর থেকে স্নাউট দেখতে পেলাম, কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেছিলাম ছোটবেলার ভূগোল ক্লাসে। স্নাউট দেখে টুপুরও বেশ উত্তেজিত।

৪০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত গঙ্গা মার মন্দিরে পুজো দিয়ে তপোবনের রাস্তা ধরলাম। এবারই আসল পরীক্ষা। হিমবাহকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকের চড়াই পেরিয়ে ৫ কিমি দুর্গম পথ অতিক্রম করলে তবেই আজকের গন্তব্যে পা রাখতে পারব। আলগা পাথর আর মাটিতে পা রাখা যাচ্ছে না,মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে যাব। কোনরকমে ওপরে উঠে এলাম। এবার ক্রিভাস অর্থাৎ বরফের ফাটল দেখা যাচ্ছে সর্বত্র, চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ, এ যেন বরফের দুনিয়া। ধূসর, রুক্ষ, প্রায় জনমানবহীন বরফরাজ্যে ক্ষুদে ট্রেকারও বাকরুদ্ধ।

এই বরফ মাড়িয়েই আমাদের যেতে হবে। অতি সাবধানে, প্রতি পদক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারনে হিমবাহ দ্রুত গলে যাচ্ছে আর তপোবন যাবার রাস্তাও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশ। প্রতিদিন রাস্তা বদলে যাচ্ছে, ৩/৪ দিন আগে যে রাস্তা দিয়ে কোন দল গেছে আজ সেখানে রাস্তা নেই। তাই ক্লান্ত হয়ে বসার উপায় নেই গাইড এগিয়ে গেলে আমার সেখানেই বসে থাকা ছাড়া আর কোন কিছু করার থাকবে না। ওপর থেকে নীচে বরফের চাঁই গলে পড়ছে। ভীষণ ভয় পেয়েছি,আতঙ্কে মুখ বন্ধ সবার। যে রাস্তায় আমি নিজেই ভয়ে ভয়ে হাঁটছি সেখানে মেয়েকে নিয়ে হাঁটি কি করে? তাই এই পথ গাইড আঙ্কলের হাত ধরে,

যেখানে পারছে না কোলে করে টুপুর চলে। আবার দেখছি এই পথেই সাধু-সন্ন্যাসীর দল খালি পায়ে হাসি মুখে হেঁটে চলেছেন। মনে জোর এনে আমরাও প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে গাইডকে অনুসরণ করে চলি। কোন বিরতি ছাড়া তপোবনের ঠিক নীচে থামলাম। আর ১ কিলোমিটার খাড়া চড়াই উঠতে হবে ১০০০ ফুট। উঠতে গিয়ে পা যেন আর চলছে না, চড়াইয়ের প্রথম ধাপ পেরিয়ে থামলাম,পথ আটকেছে আকাশগঙ্গা ঝরনা। জলে জুতো গেল ভিজে।

বাকি পথ পার হয়ে তপোবনে পৌঁছে স্তম্ভিত হই,এ যে স্বর্গ! কষ্ট সার্থক হয়ে গেল। বরফ রাজ্য পেরিয়ে সাড়ে ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত সবুজ এই উপত্যকা সাধুদের তপস্যাভূমি। ক'জন সাধারণ মানুষ এখানে পৌঁছতে পারে? পাশে প্রবহমান আকাশগঙ্গা নদী, কেউ কেউ বলেন এটিই গঙ্গার মূল উৎস। সামনে শিবলিঙ্গ, মেরুপর্বত, ডানদিকে ভাগিরথী - ১, ২, ৩ স্বমহিমায় বিরাজিত। আকাশে কালো মেঘ জমছে। তেমনি ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। রাতে তুষারপাতের সম্ভাবনা আছে। ঠাণ্ডায় বাইরে থাকা যাচ্ছে না। তাঁবুতে ঢুকে গরম স্যুপ খেতে বেশ লাগল। রাতে তাপমাত্রা কমতে কমতে হিমাঙ্কের দশ ডিগ্রি নীচে নামল। এদিকে টুপুর কিছুই

গোমুখ

ভাগিরথী সিস্টার্স - ১, ২, ৩

খাচ্ছে না, খাওয়ালেই বমি করছে। আমরা ঠিক করলাম সকালেই নীচে চলে যাব, আরেকটা দিন এখানে থাকার ইচ্ছা থাকলেও সে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। রাতে ঘুম সেভাবে হল না।

ভোরের আলো ফুটতেই বাইরে এলাম। নির্মেঘ নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র শৃঙ্গে লাল রঙের ছটা,নদী জমে বরফ হয়ে গেছে,সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। অসাধারণ লাগছে। এদিকে ঠাণ্ডায় হাত কেটে যাচ্ছে। আকাশ পুরোপুরি মেঘমুক্ত, রোদও উঠেছে। ঘাসের ওপর, তাঁবুর ওপর জমে থাকা বরফ গলছে, স্বর্গের আঙিনায় প্রকৃতি সূর্যস্নানে ব্যস্ত।

এখন টুপুর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক - ভীষণ খুশি। ওর হাত ধরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। শিবলিঙ্গের পাদদেশে করজোড়ে দাঁড়ালাম ,এখানে কোন মন্দির বিগ্রহ নেই তবুও নিজের অজান্তেই মনে ভক্তি আসে। দূর থেকে বাঙালি মাতার আশ্রম চোখে পড়ে, দেখা করে আসি মাতাজির সঙ্গে। এখানে যাঁরা আসেন মাতাজির কাছে আশ্রয় পেয়ে যান। ওনার কাছেই শুনলাম বর্ষার পর তপোবন সবুজ কার্পেটে মুড়ে যায় আর প্রচুর ফুল ফুটে থাকে। ব্রহ্মকমল,ফেনকমলের মত বিরল প্রজাতির ফুলও দেখা যায়। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে তুষারপাতে

www.amaderchhuti.com

সব নষ্ট হয়ে গেছে। উনি নিজের জীবনের কথা শোনালেন আমাদের। দূরে কোন এক্সপেডিশন টিম ক্যাম্পিং করছে - এটাই শিবলিঙ্গ ও মেরুর বেসক্যাম্প। আকাশগঙ্গা নদী,পবিত্র শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ আর মাতাজিকে ছেড়ে যেতে আমাদের মন চাইছিল না। টুপুরও ফিরতে চাইছে না এত সুন্দর জায়গায় এসে মাতাজির কাছে এতরকম গল্প শুনে। বিশ্বাসই হচ্ছে না এই মেয়ে গতকাল সারারাত ভয়ে ঘুমোতে পারেনি,আমাকে জড়িয়ে শুয়ে কেঁদেছে।তবু যেতেতো হবেই। আবার আসতেই হবে এই তপোভূমিতে, এই প্রতিশ্রুতি মেয়েকে দিতে তবে সে ফিরতে রাজি হল। মাতাজির আশীর্বাদ নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

ভুজবাসা পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাল হেঁটে গঙ্গোত্রী যাব তারপর গাড়িতে উত্তরকাশী। জানি কয়েকঘণ্টা শিবলিঙ্গের পাদদেশে কাটানোর স্মৃতি অমলিন থাকবে চিরদিন, মুছে যাবে দুর্গম পথ চলার কষ্টের অভিজ্ঞতা। সবাই মিলে আবারও বেরিয়ে পড়ব হিমালয়ের ডাকে সাড়া দিতে। সত্যি টুপুরতো বড় হয়েই গেছে তাইনা?

খুদে ট্রেকার

গোমুখ-তপোবন ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি

নিজের সংসারকে সুন্দর করে রাখার ছাড়াও ঝুমা ভালোবাসেন অনেককিছুই। তাঁর ভালোলাগা-ভালোবাসার তালিকায় বই পড়া, গান শোনা, নতুন নতুন রান্না করার পাশাপাশি রয়েছে ইন্টারনেট সার্ফ করে পাহাড়ের ছবি দেখা আর নানা ট্রেককাহিনি পড়া। আসলে তাঁর কাছে সবকিছুর চেয়ে প্রিয় এই ট্রেকিং-ই। পাহাড়ের ডাকে বছরে অন্তত দুবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনই। আর এই বেড়ানোয় তাঁর সঙ্গী প্রিয়জনদের তালিকায় রয়েছে ডায়েরি আর কলমও।

---

www.amaderchhuti.com

Rate This : - select -

Total Votes : 11

Average : 4.09

Like 30 people like this.

tell a Friend

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অচিন্তনীয় চিন্তাফু

মানব চক্রবর্তী

~ চিন্তাফু ট্রেকরুট ম্যাপ ~ চিন্তাফু ট্রেকের আরো ছবি ~

একটাই স্পট থেকে ঈষৎ ডান হাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গমালা এবং বামদিকে এভারেস্ট ও তার সতীর্থ শৃঙ্গদল দেখার সবচেয়ে ভাল জায়গা হল নেপালের চিন্তাফু, তবে সে যে কতটা ভাল এখানে না এলে তা সত্যিই বোঝা যেত না।

২০১২ কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাতে বেরুলাম। সিকিমের পশ্চিম প্রান্তে ডেন্টাম হয়ে উত্তরে। হ্যাঁ, জায়গাটার নামই উত্তরে। এখান থেকে ট্রেক শুরু হবে। চিয়াভঞ্জন, ফালুট হয়ে চিন্তাফুর পথে।

উত্তরে গ্রাম

কিন্তু প্রথমেই ধাক্কা। রামধাক্কা। ট্রেক ক্যানসেল হওয়ার মত অবস্থা। উত্তরের এজেন্সি, গাইড, পোর্টার এবং তাদের নিজস্ব খরচা ইত্যাদি নিয়ে জল এমন ঘুলিয়ে দিল যে একটা গোটা দিন নষ্ট। উত্তরে বসে থাকলে পরের দিনও বেরুতে পারব না। ফলে আমাদের ঠিক করা গাইডের পরামর্শ মেনে নতুন রুটে চিন্তাফু ট্রেকিংয়ের পরিকল্পনা গাঁথলাম সেই রাতেই।

কী সেই রুট? এখান থেকে সোজা যেভাবেই হোক যেতে হবে টংলু। সেখান থেকে জৌবারি-কে ডাইনে রেখে নতুন পথ। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সিসলি, নুনথালা পার হয়ে ইঙ্গাখোলা। ইঙ্গাখোলা পার হয়ে যমুনা। এবার চড়াই পথে মাভু হয়ে টোরকে। সেখান থেকে মাইমাজোয়া। মাঝে একরাত যমুনায় থাকতে হবে। একরাত মাইমাজোয়াতে। পরেরদিন সাত আট ঘন্টার হাঁটাপথে উঠে আসতে হবে গোরুয়ালিভঞ্জন। বিকেলে রেস্ট। গোরুয়ালিভঞ্জনে রাত্রিবাস। পরদিন রাত তিনটের সময় যাকে বলে সামিট মার্চ। পেয়ে যাব সেই ঈপ্সিত ধন। নিসর্গের চূড়ান্ত এক রূপকথা। পাতাগুলো খুলে দেবে প্রথম সূর্যের মায়াবি আলো।

ভাগ্যিস উত্তরের এজেন্সি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাইতো আমাদের অভিজ্ঞ গাইড ধনকুমারের সাহায্যে এমন সুন্দর একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রুট বেরোল। সঙ্গে অতিরিক্ত পাওনা চমৎকার নদী ইঙ্গাখোলার কোলে ভ্যান গগের আঁকা ছবির মত গ্রাম যমুনা এবং পরের দিনে টোরকে ফলস্। অন্ধকারে সূর্যের আলো যেন মাইল মাইল লম্বা স্বর্ণলতার ঝুরি, তার মধ্যে দিয়ে বহু উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে সগর্জনে জলধারা।

টোরকে ফলসের সানুদেশের ভেজা ঘাসে টেন্ট পিচ করে একটা রাত্রিযাপন আমার অন্যতম একটা সেরা অভিলাষ। দেখা যাক কবে তা মেটে।

যাই হোক রাতেই প্ল্যান পাকা। পরদিন ভোরেই জিপ ধরে বাই বাই উত্তরে।

লম্বা রাস্তা। সেই ডেনটাম। সেই জোরথাং। তারপর দার্জিলিং, সুখিয়াপোখরি হয়ে মানেভঞ্জন। রাত তখন নটা।

পরদিন ভোরেই সোজা টংলুর পথে। রাতে টংলুর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে টেন্টে থাকা। চাঁদ তার গোটা কলসী উপুড় করে দিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর। এ শুধু ছবি তোলার রাত। পরদিন হাঁটা শুরু। নতুন পথ। আর জঙ্গল তো চিরনতুন। অজস্র অসংখ্য শতাব্দীপ্রাচীন জঙ্গুলে গাছ, তাদের বড়দা হল রডো, আহা হা... রডোডেনড্রনের ছায়ায় হাজারো গাছের ছোটবড় জট খুলতে খুলতে পথ চলা।

এ পথে ট্রেকাররা যে যায় না তার প্রমাণ পেলাম প্রায় ঘন্টা দুয়েক হেঁটে এক গ্রামবাসীর বিস্ময়াবিষ্ট মুখচোখ দেখে। পিঠের স্যাক আর রঙিন পোষাক তাকে মনে হয় তিনজন গ্রহান্তরের মানুষের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইঙ্গা খোলা

www.amaderchhuti.com

ইঙ্গাখোলার অনর্গল জলপতনে পাহাড়ি নদীতে সারারাত জুবিন মেহতার অর্কেস্ট্রা, আর আমরা তিনজন যমুনার মাটির ঘরে ছাং আর থুম্বার যৌথ আকর্ষণে এক পরাজগতে বিচরণ করি। রাত কাটে। সকালে হলুদ গাঁ আর হলদেটে চামড়ার নেপালি গ্রাম্যতার মাঝে চোখের জলের ইশারা রেখে পথ হাঁটি।

গোরুয়ালিভঞ্জন যাওয়ার পথে

ক্রমে মাভু। মাভু এক, দুই, তিন, এইভাবে সাতটা গ্রাম, সেই অল্প অল্প চড়াই, এসে পৌঁছাই টোরকে। কাঁধ আলগা দিই। স্যাক নামাই।

রান্না করবে ধনবাহাদুর আর পোর্টার রাজু। আমরা চললাম টোরকে ফলস দেখতে। আধমাইল উজিয়ে তার ইশারাটুকু পাই। ইশারাতেই মস্ত। সামনে সাক্ষাৎ হলে কী হবে! দ্রুত ট্রাভার্স করে নামি। দেড় হাজার ফুট তো বটেই। তারপরেই এক ইস্পাতের তারের অনিন্দ্যকান্তি ঝোলানো সেতু। ব্রিটিশদের তৈরি। অপূর্ব। পা পড়লেই ছড়া কাটে - দোল দোল দুলুনি রাঙ্গা মাথায় চিরুনি।

এগিয়ে যাই আড়াইশো ফুট উঁচু থেকে ঝরে পড়া জলস্রোতের দিকে। ঘাসে শুই। এক আশ্চর্য পৃথিবীর গহীন-গভীর ভার্জিনল্যান্ড।

এখানে একটা জীবন কাটানো যায় পাখির নীড়ের মত চোখের স্বপ্নে।

ফিরে এসে কোয়াস সেদ্ধ। ভাত। লংকা। আহা রামরোচো (খুব ভাল)। বিকেলে পৌঁছাই মাইমাজোয়া। রাতে একটা হোটেলের ঘরে আশ্রয়। দুপাশে পাঁচ-ছটা থাকার জায়গা আছে।

সকালে উঠে ফের চলা। আজ যেতে হবে গোরুয়ালিভঞ্জন। সম্ভব হলে বিকেলেই চিন্তাফু। কিন্তু বেয়াড়া পথ। চড়াই। চড়াই। ফলে ক্ষুধার্ত তিনজন দুপুর পেরিয়ে গোরুয়ালিভঞ্জন। ঠিক হল রাতে এখানেই থাকা।

মাইমানজুয়ার পথে

গ্রামের মানুষরাই থাকার জায়গা করে দিলেন। ট্রেকার এলে কোনো অসুবিধা নেই। সামান্য টাকাপয়সা বা চালডাল দিলে এরাই রান্না করে দেবে।

আমরা কিন্তু নিজেরাই ওদের কাঠের আগুনে রান্না করলাম। খিচুড়ি। ওদের কাঠ, ওদের আগুন, আমাদের চালডাল - এই হল যথার্থ ফিউশন। ফলে গান হল। নাচ হল। এবং খাওয়া। আমাদের খিচুড়ি ওরাও থালভরে খেয়ে খুব খুশি।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাত পায়ের আঙুল জ্বালা করছে। মাইনাসের নীচে ঠাণ্ডা। মুজো গ্লাভসে মানছে না। রাত তিনটেয় টর্চ নিয়ে ফাইনাল থ্রাস্ট।

তিনজন আমরা, সঙ্গী দুজন, মোট পাঁচ, পাঁচটা টর্চের আলো পাহাড়ে-পাথরে-বোল্ডারে-জঙ্গলে আলোর ধারাপাত খুলে খুলে পথ চলে। এখানে বড্ড চড়াই। চার হাত-পায়ে হামা দিই। এইভাবে আলোর মালা কাছে-দূরে। অবশেষে ঠিক দু'-আড়াই ঘন্টা পরে পৌঁছে গেলাম চিন্তাফু টপে। জঙ্গল-পাহাড় পেরিয়ে ওপরে জায়গাটা খানিক সমতল। একটা সরু লম্বাটে জায়গা। পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি আর প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপছি। অন্ধকার ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। সেই ঢালে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার পাশে অন্যান্য শৃঙ্গমালা এবং আন্দাজ তিরিশ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে বাঁদিকে এভারেস্ট লোৎসে। সূর্যের কুসুম আলোয় সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটু পরেই আলোর খেলা শুরু হল দুই শৃঙ্গমালার মাথায়।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় - চিন্তাফু থেকে দেখা

একবার ডাইনে তাকাই পরক্ষণেই বাঁয়ে। এত কাছ থেকে দুই মহান শৃঙ্গমালা এভাবে দেখা ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্য তো বটেই নইলে আকাশ এত পরিস্কার থাকে! সঙ্গী অভিরূপ তার ক্যামেরায় মুহূর্তগুলি ধরে রয়েছে একের এক। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট। বহু ছবি তোলা হল। ওই একচিলতে সমতলে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি দারুণ সুন্দর একটা কাঠের ট্রেকার্স হাট। ভেতরে আগুন জ্বালানোর জায়গাও আছে। ততক্ষণে রাজ আর ধনকুমার কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। নীচে মেঘসমুদ্র। প্রাণভরে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে আর কিছুসময় আগুন সেঁকে এবারে নীচে নামার পালা।

ফেরার আগে ভালভাবে আগুন নিভিয়ে দিলাম। চোখে পড়ল ট্রেকার্স হাটের কাঠের দেওয়ালে যত্রতত্র নাম লিখে রেখেছে আমাদের আগে আসা অন্য ট্রেকাররা। এই বালখিল্যতা কবে বন্ধ হবে কে জানে!

www.amaderchhuti.com

মাউন্ট এভারেস্ট - চিন্তাফু থেকে

~ চিন্তাফু ট্রেকরুট ম্যাপ ~ চিন্তাফু ট্রেকের আরো ছবি~

কথাসাহিত্যিক মানব চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘কুশ’ আবির্ভাবেই জনপ্রিয় হয়েছিল। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে মানবের লেখা ছোট গল্পগুলি। কয়েকটি ছোটগল্পের মঞ্চায়নও হয়েছে। তবে শুধু কলমই নয় মানবের ভালোলাগার আরেক নাম ভ্রমণ। মাঝেমধ্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতি আর মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যেতে। ষাট পেরনো এই যুবক এখনো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন ট্রেকিং-এর কথায়। অনেক পাহাড়-সাগর পেরিয়ে তাঁর চরৈবেতি ভারতবর্ষের নানান প্রান্তরে আজও অবাধ।

www.amaderchhuti.com

Rate This : - select -
Total Votes : 8
Average : 4.63

Like 8 people like this.

tell a Friend

Post Comments

manab da go ahead you are our inspiration.the next generation learn and encourage from your writing.

- TAPAS BANIK [2013-05-15]

খুব ভালো লাগল।

- Abu [2013-04-22]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

এক ভ্রমণে দুই দেশ

মঞ্জুশ্রী সিকদার

~ তথ্য - নিউজিল্যান্ড ‖ নিউজিল্যান্ডের আরো ছবি ~

[গত সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়া-র পর]

২৮ নভেম্বর

এবার নিউজিল্যান্ড। ২৮ তারিখ সকালে বিমানে অকল্যান্ড পৌঁছেছি। ইমিগ্রেশনের বিস্তর ঝামেলা পেরিয়ে গাড়ি করে পাড়ি দিলাম হ্যামিলটন শহরের পথে। সাজানোগোছানো শহর পেরিয়ে বিশাল চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে -দুপাশে উঁচু-নীচু টিলা -আগ্নেয়গিরির লাভা জমে তৈরি হয়েছে এই সব অঞ্চল - এখন সবুজে সবুজ -গরু, ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি দাঁড়ালো ওয়াইটোমো গ্লোওয়ার্ম কেভের (Waitomo Glowworm Cave) সামনে -এই গুহাটা দেখার অনুভূতি ভাষায় বোঝানো যাবে না। অন্ধকার গুহার মধ্যে বোট রাইডিং -ওপরে আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে অজস্র জোনাকি। এই গুহাটি বহুদিন পর্যন্ত অনাবিস্কৃত ছিল – স্থানীয় মাওরিরা এই কেভকে সর্বসমক্ষে আনতে চায় নি। ১৮৮৭ সালে মাওরি চিফ তানে তিনোরাউ একজন ইংরেজ জমি পর্যবেক্ষক ফ্রেড মার্ককে সঙ্গে নিয়ে এই কেভটি আবিস্কার করতে যায়। এই গুহায় ঢোকার একটাই রাস্তা এবং সেটা ওয়াইটোমো নদী দিয়ে। গাছের কাণ্ড দিয়ে ভেলা বানিয়ে তাতে চড়ে তারা গুহায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে। অন্ধকার গুহায় ঢোকার পর একসময় হাতের মোমবাতিটাও নিভে গিয়েছিল – আর তখনই তারা দেখতে পেয়েছিল গুহার ভিতর পাহাড়ের গা অজস্র জোনাকির আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারিতে তাদের চোখে পড়েছিল পাহাড়ের গায়ে অনেক লাইম স্টোনের ফরমেশন রয়েছে। ১৮৮৯ সালে পর্যটকদের জন্য গুহাটি খুলে দেওয়া হয়। এই গুহায় এখন যাঁরা কাজ করেন তারা তানে তিনোরাউ-এর পরবর্তী প্রজন্ম।

www.amaderchhuti.com

গুহা দেখা শেষ করে আমরা আবার বাসে করে চলেছি রোটরুয়ার পথে। যতদূর দৃষ্টি যায় কী অপূর্ব শোভা। পুরো নিউজিল্যান্ডটাই উঁচু নীচু সবুজ মাঠ আর খ্রীষ্টমাস ট্রি দিয়ে সাজানো। তাছাড়া আরও কত সুন্দর বড় বড় গাছ -মাঝে মাঝে ছোট একটা বাড়ি। মাওরি ভিলেজ দেখলাম - কাঠের শিল্পকলা দেখার মত - আলাস্কার টোটেম পোলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। রোটরুয়াতে অ্যাগ্রোডোম দেখলাম। ভেড়ার শরীর থেকে সমস্ত লোম কি ভাবে চেঁচে নেয় তা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। ভেড়াদের খেলাও দেখলাম। বেশ খানিকক্ষণের ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত কিউই পাখির দর্শনও মিলল। এরা সব সময় ঝোপের আড়ালে থাকে। গাইড নির্দিষ্ট জায়গায় আমাদের নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। খুবই অল্প সময়ের জন্য আমরা তার দেখা পেলাম। কিউয়ি জুতো পালিশ এখানেই তৈরি হয়। এরপর এলাম ফুটন্ত কাদা বা মাড ভলকানো দেখতে। না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না কতটা জায়গা জুড়ে কাদা ফুটছে। আর কিছু কিছু জায়গায় জল ফুটছে -জল দেখা যাচ্ছে না - শুধুই ধোঁয়া। প্রকৃতির লীলা যে কত কে জানে!

৩০ নভেম্বর

অন্তর্দেশীয় বিমানে বিকেলবেলা এসে পৌঁছলাম কুইনস্ টাউন-এ। এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, ট্যুর গাইড ডারমট। গাড়ি করে হোটেলে যাচ্ছি - সাবার্ব এরিয়া দিয়ে গাড়ি চলছে - রাস্তার পাশে লেক - নীল জল - অন্যদিকে পাহাড় - পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট বাড়ি - ছবির মত সাজানো - কুইনস্ টাউন - সত্যিই রানির মত।

১ ডিসেম্বর

সকাল ছ'টায় বেরিয়ে পড়লাম মিলফোর্ড সাউন্ডের উদ্দেশ্যে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। বাস ছাড়ার অল্প পরেই একটা বড় হ্রদের ধার দিয়ে চলতে শুরু করলো - এটা নিউজিল্যান্ডের দীর্ঘতম হ্রদ -বিরাশি কিলোমিটার দীর্ঘ -নাম ওয়ানাকা। এখানে প্রচুর বড় বড় হ্রদ আছে। সবই পাহাড়ের বরফ গলা জল থেকে সৃষ্ট। এখানকার পাহাড়গুলো খুব বেশি উঁচু নয় - উচ্চতা যেমনই হোক পৃথিবীর কঠিনতম গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি আর বছরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে। ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী চোদ্দ-পনেরো হাজার বছর আগে শেষ তুষার আবহে বিশাল বিশাল হিমবাহের চাপে এই অঞ্চলের হ্রদগুলো তৈরি হয়েছে - সৃষ্টি হয়েছে উপত্যকা আর প্রান্তরের। হ্রদ, নদী, বন, পাহাড়, প্রান্তর আর নির্জনতা সব মিলিয়ে এ যেন সৌন্দর্যের এক সোনার খনি। 'তে আনাউ' শহরে একটা লেকের ধারে গাড়ি থামলো। এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম। রাস্তার ধারে টেবিল-চেয়ারে বসে জলখাবার খাওয়া -সামনে লেকের জল - কী অপূর্ব অনুভূতি।

আবার চলা শুরু। যেতে যেতে দেখছি ন্যাশনাল পার্ক - লম্বা লম্বা পীচ গাছের সারি - সবুজে সবুজ। মসৃণ চওড়া রাস্তা - গাড়ি চলেছে দুরন্ত গতিতে। হঠাৎ দেখি কাশের গুচ্ছ - চেনা ছবি কী ভাল যে লাগলো কী বলবো! আবার উইন্ড স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে বরফাবৃত পাহাড় - বড় বড় গাছগুলো দূরে সরে গেছে - দুপাশে সবুজ ঘাসজমি - তৃণভোজীদের বিচরণ ক্ষেত্র। কোথাও দেখছি পাহাড়ের মাথায় বরফ - আবার কোথাও হিমবাহ। পৌঁছালাম মিরর লেক। খাড়া পাহাড়ের গায়ে পুকুরের মতো ছোট নিস্তরঙ্গ হ্রদ। জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়। এখানকার জঙ্গলে কোন বাঁদর নেই, বন্য কুকুর, সাপ কিছুই নেই - রাতের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ানো যায়। আর তাই বোধহয় এখানে এত ভেড়া হরিণের চাষ হয়। ভেড়াদের এমনি কোন নির্দিষ্ট আস্তানা নেই - মাঠে মাঠেই জীবন কেটে যায়। গ্রীষ্মে ওদের লোম সব চেঁচে ফেলা হয় - শীতে আবার বেড়ে যায় - প্রকৃতি সব ব্যবস্থাই ঠিকঠাক করে রেখেছে। চলেছি পীচের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে - এই ধরনের জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এবার পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে নামছি - চলেছি ইষ্ট-কোষ্ট থেকে ওয়েষ্ট-কোষ্ট-এ। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় - তাই সৃষ্টি হয়েছে গভীর রেন ফরেস্টের - এত গভীর আর ঘন যে বহু প্লেন নিখোঁজ হয়ে গেছে। প্রথম প্লেনটি হারিয়ে যায় ১৯৩০ সালে। ১৯৬০ সালে তিনজন যাত্রীসহ আর একটি বিমান হারিয়ে যায় - বছর তিনেক পরে আরও একটি - এইভাবে আজপর্যন্ত তিরিশটা বিমানের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকটা চলার পর গাড়ি থামালো একটা প্রপাতের সামনে - নাম ক্রীক। আবার চলা - এখানে দেখছি শুধুই গ্লেসিয়ার ভ্যালি - গ্লেসিয়ার আগেও অনেক দেখেছি -কিন্তু এ এক অন্যরকম

সৌন্দর্য। এবার গাড়ি একটা টানেলে প্রবেশ করলো - হোমার টানেল। রাস্তাটার নাম মিলফোর্ড রোড। মিলফোর্ড সাউন্ডে যাওয়ার জন্য আগে কোন রাস্তা ছিল না। ১৯৩০ সালে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকে। আবার ১৯৩৫ সালে হোমার টানেলের কাজ শুরু হয়। কিন্তু নানারকম ঝড় ঝঞ্জা -অ্যাভালাঞ্চ গড়িয়ে পড়া, জলের স্রোত, নুড়ি পাথর তুষারপাত ইত্যাদি কারণে এই টানেল শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে সম্পন্ন হয় এবং ১৯৫৪ সালে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। টানেল পার হয়ে শুরু হ'ল নীচের দিকে নামা -এতক্ষণ আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে ছিলাম।

পাহাড়ের এই রাস্তাটা একেবারে সমুদ্রের কোলে গিয়ে মিশেছে। বাস থেকে নেমে প্রথমেই আমরা চললাম গর্জ দেখতে। এখানে আমরা একটা পাখি দেখতে পেলাম - কিয়া। টিয়া জাতীয় পাখি - খুব চালাক। একমাত্র সাদার্ন নিউজিল্যান্ডের পাহাড়ি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। বনপথে অনেকটা হেঁটে তারপর একটু সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে এলাম গর্জ দেখতে - বেশ ভালই লাগলো এই গর্জটা দেখতে - একটু অন্যরকম। এরপর আমরা এলাম সমুদ্রের ধারে - দেখবো মিলফোর্ড সাউন্ড - সাউন্ড মানে ফিওর্ড। দুপাশে খাড়া পাহাড়ের গলি দিয়ে সমুদ্র দেশের ভূখণ্ডের ভেতর ঢুকে গেলে তাকে ফিওর্ড বলা হয়। নিউজিল্যান্ডের এই অঞ্চলে বহু ফিওর্ড আছে, সেইজন্য এই অঞ্চলকে ফিওর্ডল্যান্ডও বলা হয়। মিলফোর্ড ফিওর্ড দেখার জন্য আমরা ক্যাটাম্যারান-এ চড়লাম। পাহাড়ের ধার দিয়ে যেতে যেতে ঝরনা দেখলাম। ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঝরনার জল যাওয়ার দাপটে সবাইকে ভিজিয়ে দিল। যেতে যেতে পাথরের ওপর বিশ্রামরত শীল মাছ চোখে পড়ল। লঞ্চের ভেতরে বসে আমরা লাঞ্চ করলাম - এলাহি বন্দোবস্ত। তাসমান সি-এর ওপর দিয়ে ফিওর্ডের গা ঘেঁসে প্রায় ঘন্টা দেড়েক ঘুরে ফিরে এলাম নিজেদের গাড়িতে। ফিরব কুইনস্ টাউনে।

২ ডিসেম্বর

কুইনস্ টাউন হোটেল ছাড়লাম সকাল সাতটায়। চলেছি ফ্রান্স জোসেফের উদ্দেশ্যে। নিসর্গশোভা বর্ণনাতীত। তিনটে পাহাড়ের চূড়া একসঙ্গে ঠিক যেন রানির মুকুটের মত দেখাচ্ছে -এর নাম ক্রাউন রেঞ্জ। নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ পর্বত হল মাউন্ট কুক - উচ্চতা ৩৭৫৪মিটার। যদিও উচ্চতা বেশি নয় - কিন্তু এখানে হঠাৎই আবহাওয়ার ভীষণভাবে পরিবর্তন হয় - যার ফলে অভিযাত্রীদের মৃত্যুও হয়। নিউজিল্যান্ডে একদিনে নানা ঋতু অনুভব করা যায় -এই ঠান্ডা, এই গরম, আবার এই বৃষ্টি -এইজন্য ছাতা, গরম জামাকাপড় সবই সবসময় সঙ্গে রাখতে হয়। পাহাড়ের এক জায়গায় লেখা আছে - "Here at this altitude you are close to heaven and you can speak to God."

www.amaderchhuti.com

বেলা ৯টার সময় সাবওয়ে কাফেতে বসে ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়া হল। আবার চলা শুরু। এরপর নামলাম ওয়ানাকাতে - এখানে পাজল্ ওয়ার্ল্ড দেখলাম - উল্টোপাল্টা ঘরবাড়ি -কোনটা হেলে আছে, কোনটা অর্দ্ধেক - আবার এমন একটা জায়গা যেখানে ঢুকলে গোলকধাঁধার মত রাস্তা হারিয়ে যায়, বেরনোই মুস্কিল -এইসব বাচ্চাদের মত একটু উপভোগ করলাম। আবার বাসে চলা শুরু। পথে একটা নদী পড়লো নাম ক্লুথা। হাওয়া নামে একটা গ্রাম পেরোলাম - এখানে লেকের জলে স্যামন এবং ট্রাউট দুটো মাছের সংমিশ্রণ করে চাষ করা হয় দেখলাম। চলতে চলতে ওয়ানাকা লেক পড়লো। এখন ইষ্ট-কোষ্ট থেকে ওয়েষ্ট-কোষ্ট যাচ্ছি। আবার একটা গ্রাম পড়লো নাম - মাকারোরা। দেখলাম ঝুরো পাহাড়। জার্মান আবিস্কারক হাস্ট আবিস্কৃত রাস্তা তাঁর নামানুসারে হয়েছে হাস্ট পাস। আগে কুইনস্ টাউনে যেতে দুদিন লাগতো -এই রাস্তা আবিস্কারের ফলে মাত্র দু'ঘন্টা লাগে। আমরা চলেছি রেন ফরেষ্টের মধ্য দিয়ে - কোন কোন গাছ তিনশ-চারশ বছরের পুরোনো। একদিকে জঙ্গল আর একদিকে সমুদ্র - তাসমান সি -সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাসে গাছগুলো একদিকে হেলে আছে। ১৫০০ সালে পোর্তুগীজরা এসেছিল। ক্যাপ্টেন কুক তার লোকজন নিয়ে নিউজিল্যান্ড আবিস্কার করতে এসেছিলেন। প্রথমে তার লোকজন ডাঙায় নামে, কিন্তু তারা আর ফেরে না। মাওরি যোদ্ধারা তাদের মেরে ফেলে মাংসও খেয়ে ফেলে। কুক বুঝতে পেরে অন্য আইল্যান্ডে আশ্রয় নেন কিন্তু সেখানে মাওরিরা তাঁকেও সম্ভবত মেরে ফেলে - কারণ শেষ পর্যন্ত কুকের কোন কিছুই জানা যায়নি। তাসমান সমুদ্রে মাঝে মাঝে পাথরের চূড়া রয়েছে। একপাশে পাহাড়, পাহাড়ের কোলে সমুদ্রের জল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে শীল মাছ। সবমিলিয়ে যেন একটা ছবি।

লাঞ্চ ব্রেকের জন্য একটায় গাড়ি থামলো। স্যামন ফার্মে বসে খাওয়া হল। এখানে নদী থেকে মাওরিরা জেড্ পাথর সংগ্রহ করে। এখন যে পথে চলেছি এর দুপাশে ঘন জঙ্গল - বহু বছর আগে এটা ছিল ডায়নোসরের আস্তানা। একটা গাছের নাম টোটোরা। এই গাছ বহু পুরোনো এবং সব চেয়ে বড়। চলেছি সাগরের ধার দিয়ে - তীরে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে আছে - সাগরের জল বেড়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাগরতো কিছুই নেয় না, ফিরিয়ে দেয়। তাই গাছগুলো পড়ে আছে সাগরের তীরে। পবিত্র টিয়া গাছ দেখলাম - এই গাছের কাঠ দিয়ে মাওরিদের দাহ করা হয়। ফক্স্ গ্লেসিয়ারে যাওয়ার জন্য গাড়ি দাঁড়ালো। যারা ট্রেকিং করবে তারা যথাযথ পোষাক পরে ওখানকার গাইডের সঙ্গে রওনা দিল। অনেক সময় লাগবে। আমরা তিনজন যাইনি ট্রেকিং করতে। আমাদের গাইড ডরম্যাট আমাদের গাড়ি করে নিয়ে এল জঙ্গল ঘোরাতে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা পায়ে হেঁটে জঙ্গল ঘুরতে চললাম। একটা নদীর ওপর ব্রীজ। সেই ব্রীজ পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম - গভীর জঙ্গল - কতরকমের গাছ -সূর্যের আলো খুব বেশি ঢুকতে পারে না। এই জঙ্গলটার নাম ওয়েস্টল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক। এখানে একটা গাছ দেখলাম খানিকটা আমাদের দেশের ঢেঁকি শাকের মত কিন্তু লম্বায় বেশ বড় - মাথাটা গোল করে পেঁচানো - আর চিত্রবিচিত্র করা - নাম কোরু (Koru) - এটা নিউজিল্যান্ডের বিমানের পিছনের সিম্বল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৮৩৫ সালে গ্লেসিয়ার যেখানে ছিল সেই জায়গাটা দেখলাম - সেখান থেকে গ্লেসিয়ার অনেক সরে গেছে। ১৮৯৫ সালে যেখানে পিছিয়ে গেছে সেখানে হেঁটে যেতে ২ ঘন্টা সময় লাগে। ট্রেকিং করে সহযাত্রীরা ফিরে আসার পর সবাই চললাম রাতের আস্তানায় - হোটেল বেলা ভিস্টা, ফ্রান্স জোসেফ গ্লেসিয়ার।

৩রা ডিসেম্বর

ভোরবেলা হোটেলের ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ভোরের রবিকিরণে ঝলমল করছে ফ্রান্স জোসেফ গ্লেসিয়ার - দেখে মনে হচ্ছে এত কাছে যেন এক ছুটেই পৌঁছে যাব। বেলা বাড়লেই মেঘে ঢেকে যাবে বরফ তাই সবার দরজায় নক করে ডেকে তুললাম এই দৃশ্য দেখার জন্য। ভাল জিনিস সবাই মিলে উপভোগ করলে বেশি ভাল লাগে।

সকাল ৯-৩০য় তল্পিতল্পাসহ উঠে পড়লাম গাড়িতে - যাব গ্রে-মাউথে। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা চলার পর আমরা গ্রে-মাউথ ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ওয়েষ্ট কোষ্টে গ্রে-মাউথই সবচেয়ে বড় টাউন। গ্রে-মাউথ ষ্টেশন থেকে ট্রাঞ্জ আলপাইন বা ট্রাঞ্জ সিনিক ট্রেনে চড়ে আমরা ক্রাইষ্ট চার্চ শহরে পৌঁছব। চার ঘন্টা ধরে এই সফর শুধু প্রকৃতিকে দেখার জন্য - পাহাড় কেটে কেটে তৈরি হয়েছে রেলপথ -Tranz Alpine is one of the top six rail journeys in the World। আমাদের

ড্রাইভার মালপত্রসহ গাড়ি নিয়ে ক্রাইস্ট চার্চ স্টেশনে অপেক্ষা করবে। দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়েই গাড়িতে উঠেছিলাম। খেতে খেতে বাইরের শোভা দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম। মাঝে ট্রেন বিশেষ বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছে আর সবাই নেমে দেখছে, ছবি তুলছে। এইভাবে চারঘন্টা চলার পর বিকেল ৬-০৫ এসে পৌঁছলাম ক্রাইস্ট চার্চ শহরে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি চারটি জাহাজে চেপে ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা এখানে আসে। তাদের এখানে আসার বছর পাঁচেক পরে নিউজিল্যান্ডের প্রথম শহর হিসেবে ক্রাইস্ট চার্চের পত্তন ঘটে। স্টেশনে পৌঁছে ড্রাইভার আমাদের বাসে করে সোজা নিয়ে এল শহর ঘোরাতে। প্রথমে বাইরে থেকে ক্যাথিড্রাল দেখলাম। আর্ট গ্যালারীও দেখতে হল বাইরে থেকে। এরপর সোজা চলে এলাম বটানিক্যাল গার্ডেনে। গার্ডেনে ঢোকার মুখে একটা প্রাসাদের মতো বড় বাড়িতে এই শহরের মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের অনেকটা অংশ জুড়ে মাওরিদের জীবনধারা ও পুরোনো সংস্কৃতির পরিচয় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মিউজিয়ামের পর এলাম বাগানে। দেড় হাজার বিঘে জমি নিয়ে এই বাগান। সব ঘুরে দেখা সম্ভব নয় - নানারকম গাছ দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলাম গোলাপ বাগানে। অনেক জায়গায় গোলাপ বাগান দেখেছি। কিন্তু এ যেন কেমন অন্যরকম। ফেরার পথে মাত্র আট দশ হাত চওড়া নদী দেখলাম - নাম আইভন। ২০১১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিশাল ভূমিকম্পের ফলে ক্রাইস্ট চার্চ শহর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের একটা দিকে একবারে প্রবেশ নিষেধ - একদম ঘিরে রাখা রয়েছে। তাই আর বিশেষ কিছুই দেখা হয় নি। এরপর আমরা চলে এলাম সুদিমা এয়ারপোর্ট হোটেলে।

৪ ডিসেম্বর

কুইন্‌স্ টাউনে বেলুন রাইড হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঝোড়ো বাতাসের কারণে সেটা বাতিল হয়ে যায়। আমাদের গাইড বলেছিল চেষ্টা করবে যাতে ক্রাইস্ট চার্চে বেলুন রাইড করাতে পারে। ৩ রা রাতে গাইড জানিয়ে দিল আমরা যেন ৪ তারিখ ভোর চারটের সময় প্রস্তুত থাকি। বেলুন চড়া হবে। ভোর ৪-২৫ মিনিটে গাড়ি এসে আমাদের হোটেল থেকে তুলে নিল। আরও কয়েকটি হোটেল থেকেও যাত্রী তুললো। মোট কুড়ি জন চলেছি বেলুন রাইড করতে। মাঝপথে গাড়িতে আর একজন পাইলট উঠলো। আর আমাদের গাড়ির সঙ্গে আর একটা গাড়িকে জুড়ে দেওয়া হল। এই গাড়িটার মধ্যে বেলুনের সব সরঞ্জাম ছিল। এরপর একটা বিশাল ক্ষেতের মাঝখানে গাড়িটা থামলো। আমরাও নামলাম। একটা বিশাল বেতের বাসকেট, কাঁধ সমান উঁচু - নামানো হল। তারপর একটা মস্তবড় গোল বালিশের মত প্যারাশুটের তৈরি জিনিস নামানো হল। তাছাড়াও গ্যাস সিলিন্ডার, ওভেন, পাখা ইত্যাদি নামানো হল। আমাদের কুড়িজনকে সমান দুটো দলে ভাগ করে দুদিকে দাঁড় করানো হল। এবার বালিশটার দড়ি খুলে বের করা হল বেলুন। দু'দল দুদিকে টানতে টানতে প্রথমে চওড়া দিকটা খোলা হল - তারপর আবার নির্দিষ্টভাবে লম্বার দিকে টানা হল। এরপর দুদিকে দুটো পাখা লাগিয়ে বেলুন ফোলানো হল। বাস্কেটের অংশটার সঙ্গে বেলুনটাকে লাগানো হল। বাস্কেটের মধ্যে প্রধানতঃ চারটে খোপ - পাঁচজন করে এক একটা খোপে ঢুকে পড়লাম। আর মাঝখানটায় প্রধান চালক, গ্যাস ইত্যাদি সহ উঠে পড়লো। গ্যাস জ্বালিয়ে, আগুন জ্বেলে বেলুনের মধ্যে আস্তে আস্তে হাওয়া গরম করা হতে থাকলো - হাওয়া গরম হলে বেলুন ওপরে উঠতে শুরু করলো। নির্দিষ্ট সময়ের পর আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল। বাস্কেটের মধ্যে আমরা একুশজন আকাশে বেলুনের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে চলেছি। এও এক বিরল অভিজ্ঞতা। ওপরে ওঠার পর পাইলট জানালেন এই বেলুনটাই নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বেলুন - ৪৩ মিটার লম্বা। যাত্রী ধরে ২৪ জন ও ২ জন পাইলট। খুব আস্তে আস্তে চলছিল বেলুনটা বোঝা যাচ্ছিল না যে চলছে। এক ঘন্টা চলার পর এবার নামতে লাগলো - কোথায় নামবে কেউ জানে না। গাড়ির পাইলটের সঙ্গে বেলুনের পাইলটের সারাক্ষণ ওয়াকিটকিতে কথা হচ্ছিল। অবশেষে অন্য একটা শস্যক্ষেতে এসে পৌঁছলো। এরপর আবার একইরকমভাবে বেলুনের হাওয়া বের করে সবাই মিলে তাকে কেসের মধ্যে পুরে ফেললো। শ্যাম্পেন খুলে সবাই মিলে বেলুন রাইডের সাকসেসকে সেলিব্রেট করা হল। আমরা যারা যাত্রী ছিলাম, তারাও সবাই যেহেতু বেলুন চালানোয় সাহায্য করেছে তাই সবাইকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হল। এও এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতার স্মারক। জানিনা আমার এই পরিব্রাজকের জীবনে আরও কত কিছু পাওয়ার আছে...।

~ তথ্য - নিউজিল্যান্ড ‖ নিউজিল্যান্ডের আরো ছবি ~

ভারত সরকারের মহাগাণনিক দপ্তর থেকে অবসর নেওয়া মঞ্জুশ্রীর পায়ের তলায় সর্ষে। সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে আসেন এদেশ-ওদেশ। ছয় মহাদেশের মাটিতে পা রাখার পর এখন তাঁর স্বপ্ন আন্টার্টিকা ভ্রমণ।

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

অতীতের খোঁজে

মার্জিয়া লিপি

লখনউতে সার্ক সাহিত্য সম্মেলনের গোধূলিবেলায় ভাবছিলাম বেশি দূর তো নয় এলাহাবাদ - প্রয়াগকে ঘিরে পুরাণের গল্পকথা কতই শোনা, ঘুরে আসি একবার। পুরাণের বারণাবত, আর্য সময়কালে প্রয়াগ, পরবর্তী যুগে এলাহাবাদ - পুরাণ, ইতিহাসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব ভাবতে সঙ্গী হল আরও তিনজন। তাদের মধ্যে পার্থ পাভেলের গল্প ঠিক যেন রুপোলী পর্দার কোন ঘটনার মতো। সেও এসেছে অতীতের খোঁজে - তার শিকড়ের সন্ধানে। একসময় তার ঠাকুরদাদা বসন্তকুমার তালুকদারের ভিটে বাড়ি ছিল কিডগঞ্জে - ৩৫/৩৭ বিচওয়ালি সড়কে। চাকরি করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে। ঠাকুরদাদা মারা যাওয়ার পর ১৯৩৭ সালে বাবা প্রীতিরঞ্জনকে নিয়ে দাদী সুনামগঞ্জে পৈত্রিক বাড়িতে চলে আসেন। তারপরের ঘটনা উপমহাদেশের ইতিহাসের দেশবিভাগের স্বপ্নভঙ্গের মতোই।

২০ মার্চ কাকডাকা ভোরে লখনউ থেকে নরচণ্ডী এক্সপ্রেসে এলাহাবাদের জন্য রওনা দিলাম। প্রয়াগ পেরিয়ে সাত কিলোমিটার দূরে রেলস্টেশন। শিকড়ের টানে বসন্তকুমারের তৃতীয় প্রজন্ম সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে ফেরে এই শহরে নিজেদের এককালের আবাসকে। পার্থর বিস্মিত সর্বভূক দৃষ্টি আমাকেও প্রভাবিত করে, আমিও আবিষ্কারের চোখে খুঁজে ফিরি পৌরাণিক এই শহরকে।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর উপরে ব্রিজ

www.amaderchhuti.com

এককালের প্রয়াগের আধুনিকীকরণ ঘটে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে। ১৫৮৩ সালে যমুনার পাড়ে গড়ে তোলেন বিশাল দূর্গ যা আকবরের কেল্লা নামে পরিচিত। ইতিহাসের পথ বেয়ে একে একে দেখতে থাকি ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বাসভবন, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মস্থান স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ জাদুঘর, হনুমান মন্দির, হরদুয়ার মুনিকা আশ্রম, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বিড়লা মন্দির, শঙ্করাচরণ মন্দির - এইসবকিছুই বারবার ছাপিয়ে যাচ্ছিল পার্থর সন্ধানী দৃষ্টি...।

অবশেষে পড়ন্ত বিকেলে এসে স্থির হলাম প্রয়াগের ঘাটে।

ত্রিবেণী ঘাট

গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী - এই তিন নদীর সঙ্গম প্রয়াগ পবিত্র হিন্দু তীর্থ। ত্রিবেণী সঙ্গম নামেও খ্যাত। রামায়ণ, মহাভারত এমনকী অনেক পৌরাণিক গ্রন্থেও উল্লেখ আছে প্রয়াগের। প্রয়াগ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা পৌরাণিক আখ্যান। সৃষ্টির আদিতে দেবতা ও অসুরের সমুদ্রমন্থনে উঠে আসে অমৃত কুম্ভ। অমৃতের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয় দেবতা আর অসুরদের। সেইসময় কুম্ভ থেকে অমৃত চলকে পড়ে মাটিতে। ভারতবর্ষের হরিদ্বার, এলাহাবাদ, নাসিক, উজ্জয়িনী এমনই চারটি পুন্যভূমি যেখানে অমৃত পড়েছিল। তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী প্রতি বার বছর অন্তর ওই চারটি জায়গায় পর্যায়ক্রমে মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। আর প্রতি ছ'বছর অন্তর বসে অর্ধকুম্ভ। রাজা হর্ষবর্ধন এখানে কুম্ভমেলার প্রবর্তন করেন বলে জানা যায়। সেকালে প্রয়াগ ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই প্রয়াগের জলে স্নান করে হর্ষবর্ধন নিজের সর্বস্ব দান করে দিতেন প্রজাদের নামে।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়াগে চলবে কুম্ভ মহামেলা। লক্ষ লক্ষ পুন্যার্থীর ভিড়ে এখানকার চেহারাই তখন বদলে যাবে। আজ নির্জনে প্রয়াগ সঙ্গমে মনের মধ্যে শুধু ফিরে ফিরে দেখছি ইতিহাস

আর পুরাণের অদেখা ছবি।
নদীর কোলে সন্ধ্যা নেমে আসে...।

লেখিকা ও পরিবেশবিদ মার্জিয়া বাংলাদেশের জাতীয় স্তরে পরিবেশ পরামর্শক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কর্মরত রয়েছেন। কাজের সূত্রে এবং ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের আনাচেকানাচে। প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ নিয়ে সেই অনুভূতির ছোঁয়াই ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে। প্রকাশিত বই 'আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথোপকথন'।

Rate This : - select -
Total Votes : 10
Average : 3.40

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বাংলার এক হারিয়ে যাওয়া মন্দিরে

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ভাঙ্গা মন্দিরের গায়ে গাছ গজিয়েছে, চত্বরটা ঢেকে গেছে ঘাস-জঙ্গলে, টেরাকোটার মূর্তিগুলো অনেক জায়গাতেই নেই, বাকি অংশেও শ্যাওলা পড়ে কালো হয়ে গেছে, তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, এককথায় অপূর্ব - অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আর মনে মনে ভাবছি যে পাশ দিয়ে কত লোক হেঁটে চলে যাচ্ছে তাঁরা ফিরেও তাকাচ্ছেন না মন্দিরের দিকে, বরং আমি যে কেন মন্দিরের সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তাতে আমাকেই ফিরে ফিরে দেখছেন। ভাবছিলাম, আমাদের দেশের, বিশেষতঃ বাংলার মানুষ তাদের অমূল্য সম্পদ সম্পর্কে কতটা উদাসীন।
বর্ধমান জেলার কামারপাড়ায় অনেকগুলি টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দির রয়েছে বলে অনেকের কাছেই শুনেছিলাম। মূলতঃ বণিক সম্প্রদায়ের (স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক ইত্যাদি) বাস ওখানে। অনেকে অবশ্য এখন বর্ধমান শহরে থেকে ব্যবসা-চাকরি ইত্যাদি করেন। বর্ধমান থেকে গুসকরা যাওয়ার পথে এটা পড়ে। নিকটবর্তী রেল স্টেশন বনপাস। তবে কামারপাড়া থেকে বনপাস একটু দূরে, ৫-৬ কিলোমিটার হবে। বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ডে কামারপাড়া যাওয়ার বাস পাওয়া যায়। অনেকদিন ধরেই সুযোগ খুজছিলাম কবে যাওয়া যায়। একদিন বেশ সকাল সকাল বেরিয়ে বাসে করে কামারপাড়া পৌঁছে গেলাম। ঘন্টাখানেক মত সময় লাগল।
বুড়ো শিবতলার একটা মন্দির দেখে সোজা চলে এলাম মিস্ত্রিপাড়ার মোড়ে। রাস্তার ধারে রয়েছে অসাধারণ সুন্দর একটি মন্দির। আর্কিওলজি বিভাগ এটি অধিগ্রহণ করেছে। এই মন্দিরটি সম্পর্কে স্থানীয় মানুষও বেশ সচেতন। মন্দিরটা দেখতে দেখতে কয়েকঘন্টা কীভাবে যেন কেটে গেল তা টের পেলাম না।
রাস্তা ধরে চলতে চলতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল সামান্য দূরের দুটি মন্দিরের ওপর। মুল পথের বাঁদিকে ছোট গলি রাস্তা; এই গলিপথের ধারে একটু ফাঁকা জায়গা, এক পাশে মন্দির দুটি। রাস্তা থেকে কিছুটা ওপরে। ফাঁকা জায়গাটা ঘাসে ঢাকা। কয়েকটা ছেলে ঘাসের চাপড়া কাটতে ব্যস্ত। মন্দিরের দিকে চোখ পড়তেই পাটা যেন মাটিতে আটকে গেল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম মন্দির চত্বরের দিকে। ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলে ভাব জমিয়ে ফেললাম। তবে এদের কাছে পুরোনো মন্দিরগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারলাম না।

কামারপাড়ার মন্দির

টেরাকোটার অলঙ্করণ

মন্দির দুটি দেখছিলাম - ডানদিকের মন্দিরের গায়ে যা কিছু টেরাকোটার মূর্তি ছিল সে সবই অপহৃত হয়েছে। মন্দিরটির দরজাও ভাঙ্গা, ঠিকমত বন্ধ হয় না। বাঁ দিকের মন্দিরটির অবস্থা তুলনায় একটু ভাল। দুটি মন্দিরের ভিতরেই শিবলিঙ্গ বর্তমান। বাম দিকের মন্দিরটিতে এখনও পুরোহিত নিত্য পূজা করেন। তবে দীর্ঘদিন এই মন্দিরগুলির কোন সংস্কার বা রঙ করা হয়নি; সেটা দেখেই বোঝা যায়। মন্দিরগাত্রে জায়গায় জায়গায় কালো ছাপ পড়েছে। বেশ কিছু ছত্রাক আছে যারা কালো পিগমেন্ট তৈরি করে।
বাঁ দিকের শিব মন্দিরটিতে টেরাকোটার মূর্তিগুলি সারিবদ্ধ অবস্থায় সজ্জিত রয়েছে। দরজার ওপরে দুই সারি এবং দরজার দুই পাশে দুটি করে মোট চারটি

সারি। ওপরের সারির মাঝখানে শ্বেতপাথরের প্রতিষ্ঠা ফলক রয়েছে। এই ফলকটি পাঠোদ্ধার করে জানা গেল মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল শকাব্দ ১৭৯১ (১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ)। এক যাদবেন্দ্র নামী পুরুষ এটির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের ওপরের সারিতে প্রতিষ্ঠাফলকের দুইদিকে চারটি করে আটটি এবং দরজার ঠিক ওপরের সারিতে গণেশের দুই দিকে তিনটি করে ছয়টি টেরাকোটা মূর্তি রয়েছে। দরজার দুইপাশের সারির বাইরের সারিতে ওপর থেকে নীচে ১১টি এবং দরজার ঠিক পাশের সারিতে আটটি করে মূর্তি রয়েছে। মন্দিরে রামসীতা এবং গণেশের মূর্তি বাদে মোট ৫২টি [৮ (৪+৪) + ৬ (৩+৩) + ২২ (১১+১১) +১৬ (৮+৮)] টেরাকোটা মূর্তি রয়েছে। এদের বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সঠিকভাবে বোঝা যায় না সেগুলি কী মূর্তি।

বাঁ দিকের মন্দিরটি দেখতে দেখতে সবে ফটো তুলতে শুরু করেছি, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাবছিলাম হয়ত কিছু বলবেন। উনি নীরব থেকে আমি কী করছি সেটাই দেখছিলেন। আমি মন্দির থেকে নীচে নেমে এসে ওনার সঙ্গে আলাপ করলাম। জানতে পারলাম এই মন্দিরদুটি ওনাদেরই। কয়েক দশক আগে ওনারা এই মন্দির চত্বরেই বাস করতেন। শিবদুর্গা পূজা হত মূর্তি এনে। বাসগৃহ, নাটমন্দির সবই ভেঙ্গে গেছে। বাস তাই আজ অন্যত্র। ওনার নাম হরেকৃষ্ণ দে। সোনারূপার ব্যবসা। শিব মন্দিরের নিত্য পূজার ব্যবস্থা ওনারাই করেন। পুরোহিত রায়পাড়ায় থাকেন। নীলের সময় এখানে বিশেষ পুজো হয়।

হরেকৃষ্ণবাবু চলে যেতেই বাঁ দিকের মন্দিরটা আবার দেখতে শুরু করলাম। পোড়ামাটির অলঙ্করণে রামায়ণ, মহাভারত, হিন্দু দেবদেবী, শ্রীকৃষ্ণ কাহিনি এবং সমাজচিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য মন্দিরের মত এখানেও রামায়ণকাহিনির প্রাধান্য লক্ষণীয়। দরজার খিলানের মুল চিত্রটিতে রামসীতাকে পারিষদসহ দেখানো হয়েছে। দরজার ঠিক ওপরে রামসীতার মূর্তি, দুইপাশে তাঁদের পরিচর্যাকারী। পাখা হাতে বাতাস করছে একজন, অপরজন ছত্রধারী। নীচে দুজন পাহারাদার বা সৈন্য - হাতে ঢাল-তলোয়ার। রামসীতার ঠিক নীচেই রয়েছে হনুমান। আর একেবারে খিলানের ওপরে স্থান পেয়েছে গণেশের মঙ্গলসূচক একক মূর্তি সঙ্গে বাহন ইঁদুর। অথচ দরজার পাশে সারিবদ্ধ অবস্থায় মূর্তিগুলির মধ্যে একটিতে স্থান পেয়েছে অর্জুনের লক্ষভেদের দৃশ্য। এখানে অর্জুনকে ধনুকে জ্যা যুক্ত অবস্থায় শর নিঃক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে দেখানো হয়েছে।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন

www.amaderchhuti.com

পুরাণের কাল থেকেই শ্রী বিষ্ণু প্রধানতম দেবতারূপে পূজিত হয়ে আসছেন। তাঁর বিভিন্ন গুণ এবং ক্রিয়াকর্ম প্রকাশের নিমিত্ত অবতারের সৃষ্টি হয়েছে বলে শ্রী হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করেছেন [হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ২য় পর্ব, পৃষ্ঠা ২১৮-২৭৩]। বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়, কোথাও দশ, বা কোথাও দ্বাদশ। এমনকী এর বেশী অবতারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও। কবি জয়দেব তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "গীতগোবিন্দম"-এ বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। কামারপাড়ার এই মন্দিরটিতে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি রয়েছে। তবে বুদ্ধের বদলে এখানে জগন্নাথ উপস্থিত।

বংশীধারী কৃষ্ণ ছাড়া নাড়ুগোপাল, কালিয়দমন এবং বকাসুর বধের কাহিনি এখানে স্থান পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের হাতে পুতনা রাক্ষসী বধের পর পুতনার সহোদর বকাসুর মথুরাপতি কংসের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের দুই ঠোঁট ধরে চিরে হত্যা করেন। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মহাদেবের ওপর আসীন দক্ষিণা কালিকা মূর্তির। তবে যে দুটি কাহিনি মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলঙ্করণ হিসাবে অগ্রাধিকার পেয়েছে তা হল রাম-রাবনের যুদ্ধ এবং পুত্রকন্যাসহ দেবী দশভূজা দুর্গা। সমাজচিত্রের একটি সুন্দর নিদর্শন এখানে রয়েছে - এক সাপুড়ে ফনাধারী বিষধর সর্প নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। মন্দিরগাত্রে এই ধরণের দৃশ্য বিরল। যে বিষধর সর্পটি দেখানো হয়েছে সেটি শঙ্খচূড় জাতীয় বলে মনে হয় - ফনাটি তুলনায় বড় এবং লম্বা। দেওয়াল গাত্রে বেশ কিছু মানুষের মুখ স্থান পেয়েছে, সেগুলিতে পাশ্চাত্য প্রভাব চোখে পড়ে।

দরজার উপরের প্যানেলে সপার্ষদ রাম-সীতা

হরেকৃষ্ণবাবুর এই শিব মন্দিরদুটি দেখে রায়পাড়া যাবার রাস্তা ধরেছিলাম। পথ চলতে চলতে মনটা ভার হয়ে রইল। বার বার হরেকৃষ্ণবাবুর মুখটা মনে পড়ছিল। বয়স্ক মানুষটি যেভাবে নিঃশব্দে এসেছিলেন সেইভাবেই ফিরে গেছেন। ভাবছিলাম, ছেলেবেলায় মন্দির সংলগ্ন বাসগৃহে ওনারা থাকতেন, প্রতিবছর ঘটা করে শিবপূজা হত। আজ সব অতীত। সেদিনের বাসগৃহ, পূজামন্ডপ, আজ কিছুই নেই। শুধু পড়ে আছে তার ধ্বংশাবশেষ। নিশ্চয় ওনার সেইসব দিনের সুখস্মৃতি আনন্দের সঙ্গে বেদনাও বহন করে আনে। হয়ত সেদিনের স্বচ্ছলতা আর নেই, তাই ধুমধাম করে শিবদুর্গার পুজো আজ হয় না। আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে এইরকম শয়ে শয়ে মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চলেছে। বাঙালি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান, মন্দির-ভাস্কর্য দেখেন অথচ বাংলার গ্রাম-গঞ্জে পোড়ামাটির এত সুন্দর মূর্তি, নক্সা ইত্যাদির সাহায্যে অসংখ্য মন্দির অলঙ্কৃত হয়েছে, সেগুলির খোঁজও রাখেন না। এইভাবেই

লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পোড়ামাটির অনন্যসাধারণ সব ভাস্কর্য যা গ্রাম বাংলার সামাজিক দলিল।

কামারপাড়ার মন্দিরের আরো ছবি

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব-র নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

Rate This : - select -
Total Votes : 10
Average : 3.40

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

Post Comments

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher